KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১১৫নং বেলিয়াঘাটা রোড, কল-১০
Collection : KLMLGK	Publisher : তরুণ চন্দ্র মিত্র
Title : চিত্র	Size : 7.25" x 9.5" 18.41 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/2 2/3 3/1 3/2 3/3	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুহৃদ চন্দ্র মিত্র	Remarks :

I.D. Roll No. : KLMLGK

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

দ্বিতীয় বর্ষ | কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৭ | তৃতীয় সংখ্যা

চিত্ত

সম্পাদক— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.

সহসম্পাদক— তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি. এস্‌সি.
সমীরকুমার বসু, এম.এ.

সম্পাদক পর্ষদ্— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
নগেন্দ্রনাথ দে, এম.বি.বি.এস., এম.আর.সি.পি., ডি.পি.এম.

সহযোগিবৃন্দ— শ্রীমতী অরুণা হালদার, এম.এ.
শ্রীমতী কনক মজুমদার, এম.এস্‌সি.
শ্রীমতী স্বপ্না দে, এম.এস্‌সি.
অজিতকুমার দেব, এম.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস., ডি.পি.এম.
বিজয়কেতু বসু, বি.এস্‌সি., এম.বি.বি.এস.
রমেশ দাশ, এম.এ., পিএইচ.ডি
রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়
হিরন্ময় ঘোষাল
অরুণ ভট্টাচার্য

পরিচালক সমিতি— সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম.এ., পিএইচ.ডি.
তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি.এস্‌সি.
প্রমদানাথ চৌবে, এম.এ.
নির্মলকুমার বসু, এফ.এন.আই.
দেবব্রত সিংহ, এম.এ., ডি.ফিল.
জ্ঞানেন্দ্র দাসগুপ্ত, পিএইচ.ডি.
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মৃণালকুমার বড়ুয়া, বি.এ.

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকার প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা) ; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

সূচীপত্র

সহজ প্রবৃত্তি ?	—সুহৃৎচন্দ্র মিত্র	...	১০৫
শিশুর মানসিক বিবর্তন	—ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার	...	১১০
আমি ও আমার মন	—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল	...	১১৮
মনের স্বাস্থ্য	—সুবিমল দেব	...	১২২
অর্থের অর্থ	—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২৫
সমাজ মনোবিদ্যা ও বর্তমান পল্লীউন্নয়ন সমস্যা	—শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু	...	১৩৫
অন্তর্দৃষ্টি	—শ্রীমতী মীরা দেবী	...	১৪০
সামাজিক কৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	—নিমাইচরণ সরকার	...	১৪৩
শিশুর ধর্মবিশ্বাস	—শ্রীমতী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	...	১৪৭
টোটেম ও টাবু	—সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড অনুবাদক—ধনপতি বাগ	...	১৪৯
লোকে আমাকে পাগল বলে	...	...	১৫১

চিত্ত

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।
কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৭ ॥

সহজপ্রবৃত্তি ?

সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম. এ., পিএইচ. ডি., এফ. এন. আই.*

মনোবিদেরা মানুষের আচার-ব্যবহার ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা আদিকাল থেকেই ক'রে আসছেন। এই চেষ্টার রূপ অবশ্য বরাবর এক রকম থাকে নি। উদ্দেশ্য, উপায়, সবেরই ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। অন্যান্য সব বিষয়ের মতো মন সম্বন্ধেও শেষ কথা বলবার সময় সম্ভবতঃ কখনই আসবে না। এক যুগে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মনোবিদেরা মনে করলেন শেষ কথা বলা হয়ে গেল, সব সমস্যার সমাধান করা হ'ল, পরবর্তী যুগে সেই সিদ্ধান্তের অনেক ত্রুটি ধরা পড়ল, আবার নতুন ক'রে গবেষণা চলতে লাগল। এই রকম করেই সব চর্চার ক্রমপরিবর্তন হতে থাকে। একজন বলেছিলেন—ইতিহাসের ধারা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এক এক যুগে কোনও একটি ঘটনা বা কোনও একটি ভাব (idea)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পরের যুগে আবার সেই গুরুত্ব আর একটি ঘটনা বা ভাব—যেটা হয়তো আগেকার যুগের ভাবের ঠিক বিপরীত—তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

মানসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করবার যে ধারাবাহিক চেষ্টা চ'লে আসছে তার ভিতরেও ঐ কথাটির প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় বুদ্ধিবৃত্তিকেই সব চেয়ে বড় ক'রে দেখা হ'ত এবং মানুষের প্রত্যেক কাজের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব কী ভাবে কতখানি কাজ করছে দেখাতে পারলেই মনোবিদেরা তাঁদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ব'লে মনে করতেন। পরে আবার এই ধারণা হ'ল যে শারীরিক অবস্থা বিশেষের উপরই মানুষের কার্যাবলী নির্ভর করে; বুদ্ধির উপর জোর দেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

যাই হ'ক, পুরাকালের দার্শনিক ভাবেই হ'ক, আর আধুনিক কালের বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই হ'ক,

* মনোবিদ্যার অধ্যাপক, নিখিলভারত সমাজ-কল্যাণ ও ব্যবসায়-পরিচালন শিক্ষণসংস্থা। (Professor of Psychology, All India Institute of Social Welfare and Business Management.)
সভাপতি, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি।

মানসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়ে সকলেই একটা তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। মন সম্বন্ধে কোনও তথ্যই সুসংবদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যদি না ধ'রে নেওয়া যায় যে কতকগুলো প্রবৃত্তি মানুষ জন্মাবার সময়েই সঙ্গে নিয়ে আসে। Instincts, prepotent reflexes, horme's drives, urges, needs প্রভৃতি অনেক নাম সেই জন্মগত প্রবৃত্তিদের দেওয়া হয়েছে। Watson-এর দাবি ১২টি নবজাত সুস্থ ছেলেকে তাঁর হাতে দিলে তিনি উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে শুধু পরিবেশের প্রভাবেই তাদের যেমন ইচ্ছে গ'ড়ে তুলতে পারেন। কোনও মনোবিদ্‌ মানেন নি মনের গঠনের এবং মানসিক কার্যাবলীর স্বরূপের জন্য কেবল পরিবেশই দায়ী। তাঁর এই তত্ত্ব একেবারেই ভিত্তিহীন। এ পর্যন্ত মানুষ মাত্রেরই মনোজগতে যা কিছু ঘটেছে সে সব ঘটনাই তাঁর তত্ত্বের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেয়। পরিবেশের কোনও প্রভাব নেই এ কথা কেউই বলেন না, কিন্তু পরিবেশই সব এ কথা কোনও যুক্তিতেই মানা যায় না।

Instrinct কথাটার বাংলা মানে 'সহজপ্রবৃত্তি'। যে সব প্রবৃত্তি শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায় তাদের সহজপ্রবৃত্তি বলা হয়। কিন্তু ঠিক কতগুলো প্রবৃত্তি নিয়ে শিশু জন্মায় এবং প্রবৃত্তির যথার্থ স্বরূপ কী সে সম্বন্ধে মনোবিদ্‌দের মতামতের মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায়। প্রথম প্রথম instinct কথাটা অত্যন্ত হালকা ভাবেই ব্যবহার করা হ'ত। মানুষের কাজের সব প্রশ্নেরই তখন একমাত্র জবাব ছিল সহজপ্রবৃত্তি। মানুষ এটা করে কেন? সে ঐ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে ব'লে। ওটা করে কেন? উত্তর একই। ভোট দেয় কেন জিজ্ঞেস করলে তাঁরা হয়তো তখন বলতেন যে মানুষ ভোট-দেবার প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে, সেই জন্যে। সাধারণ লোকে ঐ ধরনের একটা ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে খুশী হলেও অনুসন্ধিৎসুরা স্বভাবতই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা ঠিক করলেন নবজাত পশুপক্ষী এবং মানবশিশুদের ব্যবহার-সমূহ যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ না করতে পারলে বিজ্ঞানসম্মত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। মানবশিশুদের পর্যবেক্ষণ করা যায় কিন্তু তাদের উপর পরীক্ষা করার অসুবিধা সব দিক্‌ থেকেই। কাজেই জন্তু-জানোয়ারের ব্যবহার এবং তাদের উপর পরীক্ষা চলতে লাগল। বহু পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষার পর মনোবিদেরা সহজপ্রবৃত্তির কয়েকটি লক্ষণ নির্ণয় করলেন। যেমন, সহজপ্রবৃত্তি-সম্ভূত কাজের কোনও শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। পাখিকে বাসা বাঁধতে শিখিয়ে দিতে হয় না। মেষশাবক জন্ম মাত্রই মায়ের স্তন্য পান করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমনই হ'ক, সহজপ্রবৃত্তিজনিত কাজ এক এক শ্রেণীর প্রাণীর প্রত্যেক প্রাণীই ঠিক এক নির্দিষ্ট ভাবে ক'রে যায়। প্রত্যেক সহজ কর্মপ্রবৃত্তির একটি প্রধান উপকারিতা এই যে, তারা শ্রেণীটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এক একটি প্রাণী ম'রে যায় কিন্তু প্রাণীর শ্রেণী বজায় থাকে। রাম, হরি, যদু মারা যায়, কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে। তারপর যখন স্থির করবার চেষ্টা হ'ল যে এই লক্ষণযুক্ত সহজপ্রবৃত্তি কতগুলো, এবং তাদের প্রত্যেকটির কী উদ্দেশ্য, তখন এই তত্ত্বের অনেক রকমের ত্রুটি দেখা গেল। পরীক্ষাগারে নবজাত জন্তুজানোয়ারদের কার্যকলাপ বিশেষ যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তই করতে হ'ল যে, লক্ষণগুলোর কোনওটা গ্রহণ করা যায় না। যেগুলো সহজাত বলে ধ'রে নেওয়া হয়েছে সেগুলোও শিক্ষার অপেক্ষা রাখে; একই নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক প্রাণীর দ্বারা সম্পাদিত হয় না, ইত্যাদি। তা ছাড়া অনেক শ্রেণীর প্রাণী তো লুপ্ত হয়েও গেছে। সুতরাং তত্ত্বের দিক্‌ থেকে ঐ ধরনের সহজপ্রবৃত্তি মেনে নেওয়া যায় না।

অপর দিকে আবার সহজাত কিছু যে আছে সেটা একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। কারণ তা হলে জন্তুজানোয়ার, মানুষ (এক শ্রেণীর জন্তু বিশেষই) কারও জীবনের কোনও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা

করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুসন্ধিৎসুরা এই সহজাত ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতামত এবং অনুসন্ধানের ধারা লক্ষ করলে এটা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে তাঁদের সমস্ত ঝোঁকটাই রয়েছে শরীরের উপর। নবজাত শিশুর, এমন কি গর্ভে অবস্থানকালীন শিশুর শারীরিক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর মধ্যেই তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের সমাধান খুঁজছেন।

সন্তানের শারীরিক গঠনের প্রত্যেক খুটিনাটি কী কী ভাবে পিতামাতার শারীরিক অবস্থা থেকে সঞ্চারিত হয় তা হয়তো একদিন বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন। অনুসন্ধিৎসুরা এ ব্যাপারের সব বিষয়েই এখনও একমত হতে পারেন নি। এ বিষয়ের প্রচলিত সব তত্ত্বই যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এ কথাও জোর ক'রে বোধহয় বলা যায় না। হয়তো একদিন বলা যাবে। কিন্তু তা হলেই কি সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে? সন্তান তার মানসিক গঠন পিতামাতার কাছ থেকে পায়—এ কথাটা খুব সহজ এবং সরল মনে হলেও আসলে অত্যন্তই দুর্বোধ্য। পিতা অপরাধপ্রবণ, সন্তানও তাই; কাজেই সন্তান তার অপরাধপ্রবণতা পিতার কাছ থেকে জন্মাবার সময়েই পেয়েছে। এ ব্যাখ্যাটা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও আসলে একটা কল্পনামাত্র। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করা একেবারেই যায় না। বাবা-মা'র সব ছেলেমেয়েরাই এক রকম শারীরিক বা মানসিক গঠন নিয়ে জন্মায় না। এর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে আদৌ কষ্ট করতে হয় না। প্রত্যেক পরিবারেই সন্তানদের মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক গঠনের তারতম্য সহজেই লক্ষ করা যায়। চোখের রং, শরীরের দৈর্ঘ্য পিতামাতার কাছ থেকে আসে, এ কথাটার বাস্তব অর্থ হয়তো হতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতানুরাগ, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি গুণাগুণ উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানের উপর সঞ্চারিত হয়েছে বললে কি কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হয়? ঐ সব গুণাগুণের কি কোনও নির্দিষ্ট শারীরিক ভিত্তি আছে? একই পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও একটি সন্তান সঙ্গীতজ্ঞ, অপরটি নয়; একটি অপরাধপ্রবণ, আর একটি নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে (inheritance theory) দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না; এ ভাবে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হলে দুটি তত্ত্ব মেনে নিতে হয়, যার কোনওটা সুপ্রতিষ্ঠিত তো নয়ই, আদৌ প্রতিষ্ঠিত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক মানসিক গুণাগুণের একটি নির্দিষ্ট শারীরিক ভিত্তি আছে; দ্বিতীয়তঃ, সেই শারীরিক ভিত্তি পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। সেই জন্যই পিতামাতা সঙ্গীতজ্ঞ হলে সন্তানের মধ্যেও সঙ্গীতানুরাগ দেখা যায়। কিন্তু আগেই বলেছি যে ঐ দুটো তত্ত্বের কোনওটাই এখনও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই এই ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

পিতা-মাতার কাছ থেকে সন্তান কিছুই পায় না, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। পিতার ঔরসে, মাতার গর্ভে সন্তানের জীবন আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁদের কিছু প্রভাব সন্তানে লক্ষিত হবে, সঞ্চারিত হবে, খুব ব্যাপকভাবে এ কথাটা ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা ধ'রে নেওয়াই। এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, ওটা পরিবেশের ফলে হয়েছে—জোর ক'রে এ রকম বলবার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

কতকগুলো শারীরিক এবং মানসিক প্রবৃত্তি শিশু মাত্রেরই সহজাত, এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যে প্রবৃত্তিগুলো নিয়ে শিশু জন্মায় তার সবগুলোই যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, তা বলা যায় না। কারণ, তা হলে শিশুদের মানসিক গঠনের তারতম্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাচীন

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক মতামত বিবেচনা করলে এই তারতম্যের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁরা পূর্বজন্মে বিশ্বাস করতেন। সাধারণ মানুষ সারাজীবন নানারকম কাজ করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করে, কত সমস্যার সমাধান করে, কত ভাবনা-চিন্তা করে, কত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-হতাশা ভোগ করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সব সাধ তার মেটে না। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কেউ হয়তো শান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারেন; তাঁরা ধন্য। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই পরিণাম স্বীকার ক'রে নেওয়া কষ্টকর। নানারকম দ্বন্দ্বের ভিতর তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। মেনে নিতে পারি বা না পারি একদিন সব আশা-ভরসা শেষ ক'রে দিয়ে, সব চেষ্টা অসমাপ্ত রেখে, সব অর্জিত জ্ঞান নিষ্ফল ক'রে দিয়ে মৃত্যু নিয়ে যায় আমাদের তার রাজত্বে।

কিন্তু তারপর? দেহের অবসান যে ঘটে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু মনের প্রবৃত্তিগুলোও কি সেই সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়? বিনাশপ্রাপ্ত হয় ধ'রে নেওয়া খুবই সহজ; কিন্তু যুক্তির দিক থেকে 'হয় না' এ কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিতর আমরা মস্ত বড় একটা প্রভেদ করি। বিজ্ঞান বস্তু নিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে; আর দর্শন 'অবাস্তব' বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আজকের দিনে এই প্রভেদ কি বৈজ্ঞানিকরাই মানেন? জড় পদার্থ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ ক'রে তাঁরা আজ যেখানে পৌঁছেছেন সেখানকার যে ধরনের রূপসমূহ তাঁরা কল্পনা করছেন সেগুলো কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব কোনও পদার্থ বা পদার্থের সমাবেশ? গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক মাত্রই আজ জানেন যে সেই মূল কারণগুলোর বাস্তব রূপ দেওয়া যায় না। কিন্তু জড় জগতের তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করবার পক্ষে তাদের মূল্য যথেষ্টই; তাদের প্রভাব অস্বীকার করা কোনওক্রমেই চলে না।

মানসিক ক্ষেত্রে যদি আমরা ঐ ভাবে অগ্রসর হই তা হলে সেটা খুব অসঙ্গত হবে ব'লে মনে হয় না। Energy-র বিনাশ নেই। মনও গতিধর্মী। গতিমাত্রেই energy-র খেলা। সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে মানসিক energy-রও ধ্বংস হয়ে যায়, সেটা কেন ধ'রে নেব? Kinetic energy-র কোনও রকম potential form-এ থেকে যাওয়া খুব বিচিত্র কিছু নয়। হিন্দুশাস্ত্রে সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গশরীরের কথা বলে। লিঙ্গশরীর এই সব দেহবিমুক্ত মানসিক প্রবৃত্তিগুলোর potential form ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। Energy-র আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রভৃতি রীতি বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন। এই রীতি অনুসারে কোনও একটি লিঙ্গশরীর কোনও শিশু বিশেষে আকৃষ্ট হয়ে সেই শিশুর মনোবৃত্তির উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। এই রকম একটি—'তত্ত্ব' বলব না– প্রকল্প বা hypothesis গ'ড়ে নিলে শিশুদের মানসিক প্রবৃত্তির তারতম্যের ব্যাখ্যা কতকটা সহজ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন অনেক ওঠে। প্রমাণাভাবাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বও যদি অস্বীকার করা যায় তা হলে এই তত্ত্ব তো ঐ একই কারণে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা যায়।

এই তত্ত্ব মেনে নেবার পক্ষে কোনও বাধা যে নেই তা নয়। কিন্তু কী ধরনের প্রমাণ এ বিষয়ে উপস্থিত করা যায় সেটাও তো বিবেচনার কথা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও প্রমাণ উত্থাপন করা যায় না তা ঠিক। মানসিক কোনও ঘটনা ব্যাখ্যার পক্ষেই তা সম্ভব নয়। মানসিক প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানে উপগত হয়, ধ'রে নেওয়া যায়; কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। আরও একটু অগ্রসর হলে উপরোক্ত তত্ত্বে পৌঁছানো যায়; এই তত্ত্ব এখন প্রমাণ করা তো যায়ই না—এই তত্ত্বে এখন আদৌ কোনও রকম আস্থা স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করবেন।

প্রমাণ করা যায় না এমন অনেক ধারণা মেনে নিয়েই আমরা সংসারে চলি, চলতে বাধ্য হই। বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে প্রমাণের অনুসন্ধান করা; তত্ত্বের বা তথ্যের দিক্ থেকে যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করা, যা গ্রহণযোগ্য নয় তা বর্জন করা। উপরোক্ত তত্ত্ব একেবারে বর্জন না ক'রে যদি এ বিষয়ে মনোবিদেরা—বিশেষতঃ যাঁরা মনোবিদ্যা চর্চার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ ধারার সঙ্গে সুপরিচিত—আলোচনা, গবেষণা করেন তা হলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হবে। রহস্যময় মনোজগতের আর একটি 'রহস্যে'র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে।

প্রবন্ধে দুটি আলোচনার বিষয় উত্থাপিত করা হয়েছে। প্রথম, শিশু মাতা-পিতার কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়েই জন্মায়, কিন্তু শিশু যা কিছু নিয়ে জন্মায় তা সবই সে মাতাপিতার কাছ থেকে পায় না। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়, (প্রথমটি স্বীকার ক'রে নিলে) মাতাপিতার কাছ থেকে ছাড়া আর যা কিছু নিয়ে শিশু জন্মায় তার স্বরূপ কী এবং কী ভাবে সে তা পায়?

শিশুর মানসিক বিবর্তন

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, এম. এ. *

শিশুর শিক্ষাগত এবং চিকিৎসাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ছাড়াও, সামগ্রিকভাবে মানুষের মনের প্রকৃতিকে বোঝবার দিক্ থেকে শিশুর মানস-বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মন বস্তু-নিরপেক্ষ চৈতন্য সত্তার এক বিশেষ প্রকাশ, না মানবীয় দেহসংস্থান এবং পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে সঞ্জাত এক বস্তুসাপেক্ষ সত্তা—দর্শনশাস্ত্রের এই মূলগত তাত্ত্বিক আলোচনায় শিশুর মানস বিবর্তনের ইতিহাস প্রভূত আলোক সম্পাতে সক্ষম।

মন বলতে কী বোঝায়?

শিশুর 'মন' কী ভাবে গ'ড়ে ওঠে তার বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার আগে 'মন' বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটি কথা প্রথমেই ব'লে রাখা প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মন বলতে বোঝায় চিন্তা, অনুভূতি এবং সংকল্পমূলক বিভিন্ন কার্যকলাপ, যাদের প্রকাশ বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে।

মানুষের সামগ্রিক চেতনা নির্ভর করে অপরাপর জীবের থেকে পৃথক্ তার বিশেষ শারীরিক গঠনের উপর; তবে বিশেষ ক'রে মানসিক ক্রিয়াসমূহের আলোচনার দিক্ থেকে মানুষের শরীর-সংস্থানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার স্নায়ুতন্ত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ, কতকগুলো অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড এবং বিভিন্ন আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পেশীগোষ্ঠী। এদেরই বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে আমরা যে সমস্ত আচরণের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে যুক্ত হই, মন বলতে তাদের অতিরিক্ত কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা আমরা বোঝাতে চাইছি না।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরীণ (আশ্রয়) যন্ত্রসমূহের উপর বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত উদ্দীপক (stimulus) এসে আঘাত করে, অন্তর্মুখ (afferent) নার্ভের মাধ্যমে তারা সুষুম্নাকাণ্ড (মেরুরজ্জু) কিংবা মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ নার্ভ-কোষে পৌঁছায়, এবং সেখানে জাগে বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া বা সাড়া (response)। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা লাভ করি বিভিন্ন ধরনের সংবেদন (sensation), আর এই সমস্ত সংবেদনের নানাপ্রকারের যোগাযোগেই গ'ড়ে ওঠে জ্ঞানের নানা পর্যায়—যাদের সাহায্যে আমরা পারিপার্শ্বিক এবং আন্তর ঘটনাসমূহ জানতে পারি, বুঝতে পারি, মনে রাখতে পারি এবং আয়ত্তে আনবার কথা ভাবতে পারি। আবার আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত এই সমস্ত সংবেদনের ভিত্তিতেই জন্ম নেয় অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ (emotion)। এই যোগাযোগের কাজটি বেশী ক'রে ঘটে নার্ভ-মণ্ডলীর উচ্চতর পর্যায় মস্তিষ্কে—এবং সবচেয়ে জটিলভাবে গুরুমস্তিষ্কে বা cerebrum-এ।

পারিপার্শ্বিককে আয়ত্তে আনবার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পেশীগোষ্ঠীর কার্যকলাপের; আর এখানেও পরিচালনার ভার নার্ভ-তন্ত্রের উপর। কতকগুলো পেশী সঞ্চালন আমরা ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ

* কাটোয়া কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

সচেতনভাবে করতে পারি, আবার ইচ্ছাব্যতিরেকেও এদের সঞ্চালন সম্ভব। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যখন আমরা কোনও বিশেষ ধরনের পেশী সঞ্চালন করি তখন বহির্মুখ (efferent) নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্র থেকে সেই পেশীগোষ্ঠীতে আবেগ (impulse) সঞ্চারিত হয়। আর যখন উচ্চতর কেন্দ্রের 'হস্তক্ষেপ' ছাড়াই, সুষুম্নাকাণ্ডের কোনও নার্ভকেন্দ্র থেকে কার্য পরিচালনা হয়, তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতিরেকেই পেশীসঞ্চালন ঘটে। এই ধরনের কাজের নাম প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা reflex action। অবশ্য এই শেষোক্ত কাজটি মনের এলাকা বহির্ভূত।

শিশু কি মন নিয়েই জন্মায়?

সদ্যোজাত স্বভাবী শিশু উপরোক্ত মানবীয় দেহসংস্থান নিয়েই জন্মায়; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়-স্নায়ুপেশী যোগাযোগ সম্পূর্ণ না হওয়ায় তার মনের কোনও লক্ষণই তখন পাওয়া যায় না—মন ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে শিশুর শরীরসংস্থান এবং পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবী সুস্থ শিশু যে কেঁদে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে এবং হাত-পা ছোড়ে, সেটা তার মানস-সত্তার পরিচায়ক নয়। এগুলো হচ্ছে কিছুটা মানব-শিশুর আন্তর যন্ত্রসমূহের উপর নার্ভতন্ত্রের স্বতঃক্রিয় (autonomous) অংশের কার্যকলাপের ফল, এবং বাকীটা এদেরই উদ্দীপনায় পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সামগ্রিকভাবে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে উদ্ভূত প্রতিবর্তী ক্রিয়া। সুষুম্নাকাণ্ড এবং মধ্য-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ অংশসমূহ থেকেই এগুলো পরিচালিত হয়, আর সে কাজের শুরু মাতৃগর্ভেই।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই, স্বভাবী সুস্থ শিশুর নার্ভমণ্ডলী অতি দ্রুত নিজের কাজ বুঝে নিতে থাকে, যাতে শিশুর পক্ষে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্যক্ অভিযোজন সম্ভব হয়: নার্ভমণ্ডলীর কতকগুলো অপেক্ষাকৃত স্থূলভ বর্ত্মের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়; বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনার সাড়া জাগতে থাকে; উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্মিলনে উদ্ভূত হয় কতকগুলো স্থূল সংবেদনশীলতা এবং বিভিন্ন পেশী-গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই নার্ভ প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে যেগুলো শিশুর স্বভাবী জন্মের অনেক আগে থেকে, মাতৃগর্ভে থাকতেই সম্ভাব্য হয়ে ওঠে, স্বভাবতঃই তাদের কার্য-কলাপ হয় অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সুবিন্যস্ত—যেমন, মুখে কোনও জিনিস প্রবেশ করালে চুষতে থাকা, হাতের তালুতে কোনও জিনিস ছোঁয়ালে মুঠো করার চেষ্টা করা প্রভৃতি। এই ধরনের উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সম্মিলনের নাম দেওয়া হয়েছে প্রাক্ কার্যকর প্রতিবর্তন (pre-potent reflex)। এই নামটি আধুনিক শারীরবিজ্ঞায় "সহজপ্রবৃত্তি" বা instinct-এর পরিবর্তে বহুল প্রচলিত হয়েছে।

আরও কিছুদিনের মধ্যেই গুরুমস্তিষ্কের কাজ শুরু হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রতিবর্তনের মধ্যে উচ্চতর পর্যায়ের অন্বয়ংগ বা যোগাযোগ স্থাপিত হতে আরম্ভ করে, আর শিশুর সামগ্রিক ব্যবহারের গঠনে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

পারিপার্শ্বিক বলতে কী বোঝায়?

আধুনিক শারীরবিদ্ এবং মনোবিদের মতে শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার জন্মের বহু আগে থেকেই দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। সেই দিক্ থেকে একই বাড়ির একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তানের পারি-পার্শ্বিকও ঠিক এক নয়। কোনও একটি শিশুর জন্মের আগে পরিবারের আর্থ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ,

পিতামাতার বয়স এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, বাড়িতে অন্যান্য লোকের অবস্থিতি—তাদের বয়স ও সাংস্কৃতিক পর্যায়, এবং সর্বোপরি যুগের আবহাওয়া আর পরিবারের উপর বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্নমুখী প্রভাব এ সমস্ত কিছুকেই শিশুর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধরতে হবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে আশেপাশের মানুষেরা যে ভাবে কথা বলে, চলাফেরা করে, শিশুকে কোলে করে কিংবা আদর করে, যে ধরনের আবহাওয়া এবং আলোর মধ্যে শিশু বেড়ে ওঠে, এদের প্রত্যেকটাই শিশুর পারিপার্শ্বিক হিসেবে কাজ করে। শীতকালের বাচ্চা বেশী কোল চায়—এটা আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারাও ব'লে থাকেন। জন্মের সময় থেকে শিশু যে ধরনের আলোতে অভ্যস্ত হয়, অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই দেখা যায় তার চেয়ে কম বা বেশী আলোতে শিশু কেঁদে 'প্রতিবাদ' জানায়। যে শিশুকে গোড়া থেকেই বেশী কোলে নেওয়া হয় বা আদর করা হয়, তার শরীর-সংস্থান তাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়; আর সেগুলো না পেলেই অল্পদিনের বাচ্চাও 'প্রতিবাদ' জানায় কান্নার মাধ্যমে। এই প্রতিবাদের ক্ষমতা কিন্তু কোনও বস্তুনিরপেক্ষ মানস-সত্তা থেকে আসে না, আসে বিশেষ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শিশুর শরীর-সংস্থানের বিশেষ পর্যায়ে অভিযোজন-প্রচেষ্টা থেকে। এই অভিযোজন প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই শিশু ধীরে ধীরে নানা জিনিস 'শিখতে' থাকে এবং পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন মানসিক কার্যকলাপের অভিব্যক্তি আমরা তার ভিতর দেখতে পাই।

শিশু কী ক'রে শেখে? [চেষ্টীয় প্রতিবর্তন—অঙ্গসঞ্চালন]

আমাদের দেশে শিশুর শিক্ষা বলতে এখনও বহুলোকের ধারণা -"শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ"। আর চাণক্য পণ্ডিতের বয়ান অনুসারে সেটা শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সে। কিন্তু, আধুনিক মনোবিজ্ঞার মতে শিশুর শিক্ষা শুরু হয় তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই, অর্থাৎ তার শরীরের প্রতিবর্তন-প্রক্রিয়া (reflex-mechanism) চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এক একটি উদ্দীপনা (stimulation) এবং তার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া, উভয়ে মিলে গড়ে ওঠে একটি প্রতিবর্তন বা reflex*। আর বিভিন্ন প্রতিবর্তন এবং তাদের নানাপ্রকার জটিলতার বৃদ্ধির মাধ্যমেই শিশু তার পারিপার্শ্বিককে জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং আয়ত্তে আনতে পারে।

এই সমস্ত প্রতিবর্তনের (বিশেষ ক'রে চেষ্টীয় বা অঙ্গসঞ্চালনগত প্রতিবর্তনের) আবির্ভাব তাই শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিবর্তনের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের মাধ্যমে শিশুর স্বভাবী বা অস্বভাবী শারীরিক ও মানসিক বিবর্তন বুঝতে পারা যায়; এবং কী ভাবে এগুলোর বিকাশ ঘটছে তার মাধ্যমেই বোঝা যায় শিশুর নার্ভতন্ত্র ঠিক আছে কি নেই। এই প্রতিবর্তনগুলোর সুস্থ বিবর্তনে বেশ একটা নিয়মশৃঙ্খলা আছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সরল থেকে জটিলতর পর্যায়ে নার্ভ-প্রক্রিয়াগুলো গ'ড়ে ওঠে। "গিলতে পারার" মতো অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেও থাকে। আসলে, সমগ্র দেহতন্ত্রের বেঁচে থাকবার জন্য যে সমস্ত প্রতিবর্তন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেগুলোই আগে তৈরি হয়। সাধারণতঃ, শরীরের ভিতর দিক্ থেকে বাইরের দিকে প্রতিবর্তনের আবির্ভাব হয়। যেমন, বাহুর ক্ষেত্রে—আগে প্রগণ্ড বা উপরের বাহুর, পরে প্রকোষ্ঠের বা নীচের বাহুর এবং তারও পরে কব্জি ও আঙুলের প্রতিবর্তন উদ্ভূত হয়। আবার পায়ের ক্ষেত্রে, প্রথমে

* প্রতিবর্তন আর প্রতিবর্তক্রিয়া কিন্তু এক জিনিস নয়।

উরু, পরে জংঘা এবং সবশেষে পায়ের পাতা ও আঙুলের প্রতিবর্তন গ'ড়ে ওঠে। সোজা কথায়, শিশু প্রথমে উপরের হাত এবং উরু, পরে নীচের হাত এবং জংঘা এবং সবশেষে হাত-পায়ের আঙুল নাড়তে পারে।

অনেকের কাছে শিশুর মানসিক বিবর্তনের কথা আলোচনা করতে ব'সে হাত-পা নাড়ার কাহিনী 'ধান ভানতে শিবের গীতের' মতো মনে হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্তনের সামগ্রিক কার্য-কলাপের মাধ্যমেই চেতনার উদ্ভব; মন কতকগুলো আচরণবিজ্ঞাসের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং, সংবেদন-মূলক এবং চেষ্টীয় (কার্যসংক্রান্ত, motor) প্রতিবর্তনসমূহকে বাদ দিয়ে শিশুর মন কি ক'রে গ'ড়ে ওঠে সে আলোচনাই বস্তুতঃ অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষ ক'রে প্রথম দিকে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত শিশুর মুখে কথা না ফোটে ততদিন পর্যন্ত শিশুর বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালন-ক্ষমতার অগ্রগতির মাধ্যমেই বুঝতে হবে পরিবেশের সঙ্গে সে কী ভাবে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আসলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শরীর এবং মনের মধ্যে কোনও নিশ্ছিদ্র পাঁচিল খাড়া করা নেই। স্বভাবতঃই শারীরবিদ্যা এবং মনোবিদ্যার সীমারেখাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

অবশ্য, শুধু মনের প্রকৃতি বিচারের দিক্ থেকেই নয়, শিক্ষণবিজ্ঞার দিক্ থেকেও প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ার বিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতালাভের ইতিহাস বিশেষ মূল্যবান। অনেক সময় দেখা যায়, শিশু বাহুর স্থূলতর পেশীসঞ্চালনসমূহে অভ্যস্ত হওয়ার আগেই তার হাতে পেন্সিল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং আশা করা হয় এ ভাবে শিশু খুব তাড়াতাড়ি পণ্ডিত হয়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিশু এই প্রক্রিয়ায় আদৌ তাড়াতাড়ি লিখতে শেখে না। কারণ, আঙুলের পেশী-সঞ্চালন সূক্ষ্মতর প্রতিবর্তন গড়ে ওঠার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে অনাবশ্যক ঝোঁক দিলে তখনই দেখা দেয় শিশুর মানসিক জগতে বিপর্যয়। শিশুর পেশী স্নায়ু জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগাযোগের যে ধারা তাকে অস্বীকার ক'রে দ্রুততর লয়ে এগোতে গেলে তাড়াতাড়ি কাজ তো হয়ই না, উপরন্তু দেখা যায় শিশুর ভবিষ্যত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বোক্ত অস্বভাবী এবং অসমযোচিত তাড়াহুড়োর ফলে শিশুর হাতের লেখা কুৎসিৎ হতে পারে; এমন কি, অনুরূপ অন্যান্য সামঞ্জস্যহীন দ্রুতলয়ের সংযোগে শিশু ধ্বংসপ্রবণও হতে পারে।

ঐচ্ছিক আচরণের বিবর্তন: শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ!

দৈহিক জটিলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই মানস-সত্তার ক্রমবিকাশ। তবে চেষ্টীয় বিবর্তন যত বেশী পরিমাণে ঐচ্ছিক (voluntary) হয়ে ওঠে, তত বেশী পরিমাণে শিশুর মন গড়ে উঠছে বলা যেতে পারে।

শিশুর আচরণ (behaviour) প্রথমে কতকগুলো আদিম প্রতিবর্তন হিসেবে শুরু হয়; তারপর ক্রমশঃ জটিলতর বিন্যাসের দিকে এগোয়—পুনরাবৃত্তি (repetition), আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উদ্দীপকের মাধ্যমে শিক্ষা (learning), এবং বাইরের উদ্দীপক সমূহের সাহায্যে শিক্ষাদানের (training) মধ্যে দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ কোনও জিনিস ধরার কথা বলা যেতে পারে: জন্মের সময় থেকেই শিশু হাত মুঠো ক'রে থাকে, কখনও একটু শিথিল হয়, কখনও (বিশেষ ক'রে কান্নার সময়) বা মুঠো সজোর হয়। এই জন্মগত প্রতিবর্তন ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রতিবর্তনের সঙ্গে মিলে একটি আচরণের বিন্যাস বা প্যাটার্ন তৈরি করে—তিনমাস বয়সে হাত মুঠো করাটা মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্যমূলক এবং ঐচ্ছিক আচরণে

পরিণত হয়। এই একই বিবর্তনের ধারা অতিক্রম ক'রে শিশু ছ'মাস বয়সে তার দুধের বোতল বা চুষিকাঠি আঁকড়ে ধরতে শেখে, আট মাস বয়সে সাধারণ হাল্কা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে পারে, এবং হাতে তালি দেওয়া ও মুখে শব্দ করা প্রভৃতি সরল অঙ্গভঙ্গী নকল করতে শেখে।

উপুড় ক'রে শুইয়ে দিলে কয়েক সপ্তাহের শিশু একটু একটু মাথা তুলতে পারে; কিন্তু তিন মাস বয়সের আগে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার সময় অনুরূপ আচরণ দেখা যায় না। পাঁচ মাস বয়সে সাধারণ সুস্থ শিশু চিৎ থেকে উপুড় এবং উপুড় থেকে চিৎ হতে পারে। এইভাবে মাংশপেশীর শক্তিবৃদ্ধি এবং নার্ভ-প্রক্রিয়ার নানামুখী বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পেশীগোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র বেড়ে চলে। ছয় থেকে সাত মাস বয়সে শিশু কোনও নির্ভর ছাড়াই বসতে পারে; সাত থেকে আট মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে; আট থেকে দশ মাসে দাঁড়াতে পারে; তারপর, প্রথম ধ'রে ধ'রে, শেষে না ধ'রেই হাঁটতে শেখে। তের মাস বয়সে শিশু পিছু হাঁটতে পারে এবং একলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারে। দু'বছর বয়সে সুস্থ শিশু দৌড়তে পারে।

এই সমস্ত অগ্রগতি নির্ভর করে সুবিন্যস্ত প্রতিবর্তী বর্ত্মসমূহের (reflex pathways) সুষ্ঠু কার্যকলাপের উপর। স্বভাবী মানবীয় দেহসংস্থানের অধিকারী হলে যে কোনও মানব-শিশু উপযুক্ত সময়ে এই সমস্ত ঐচ্ছিক অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ করে; সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাতে ধ'রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেখানোরও প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য কোনও বিশেষ অঙ্গসঞ্চালন প্রক্রিয়া শেখাতে যাবার আগে দেখা দরকার শিশুর শরীর-সংস্থান তার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। শরীর-সংস্থান যদি মোটামুটিভাবে উপযুক্ত হয় এবং শেখাবার পদ্ধতি যদি সহায়ভূতি ও অনুপ্রেরণামূলক হয় তা হলে শিশু এই সমস্ত কাজ ক'রে আনন্দ পায়; এই আনন্দই হচ্ছে কোনও কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করার দিকে শিশুর আগ্রহ জন্মায়—মানসিক বিবর্তনে সে অনায়াসে বড় বড় ধাপ পেরিয়ে যায়। শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা যাদের হাতে থাকবে তাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে শিশুকে জোর ক'রে বড় করার চেষ্টা 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর' মতোই বাতুলতা। বয়স্কদের কর্তব্য শিশুকে বড় হতে সাহায্য করা—আসল কাজটা শিশুর নিজেকেই করতে হবে।

প্রতিবর্তনের দুটি ধারা

শিক্ষাদানের সমস্যাকে ভালভাবে বুঝতে হলে প্রতিবর্তন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আর একদিক্ থেকে কিছুটা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। শারীরবিদ্যা মতে প্রতিবর্তন-প্রক্রিয়া দুরকমের—অনপেক্ষ প্রতিবর্তন বা unconditioned reflex এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তন বা conditioned reflex।

প্রতিটি জীবের মধ্যেই তার জাতি (species) অনুসারে কতকগুলো প্রতিবর্তনের সম্ভাবনা জন্ম থেকেই মজুত থাকে; দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই নার্ভ-পেশী-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ বাড়তে থাকে, ততই বিভিন্ন প্রকারের আন্তর ও বহির্জগতীয় উদ্দীপকসমূহের সংস্রবে দেহময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া বা সাড়া জাগতে থাকে। এই ধরনের প্রতিবর্তনকে অনপেক্ষ প্রতিবর্তন বা unconditioned reflex বলা হয়। এই জাতীয় প্রতিবর্তনের মাধ্যমে মানবশিশু শেখে নানাজাতীয় চেষ্টীয় (motor) কার্যকলাপ; নিজের দেহ এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান বেড়ে ওঠে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-সম্পর্কিত সংবেদনসমূহের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে।

প্রতিবর্তন-প্রক্রিয়ার উন্নতির এক বিশেষ পর্যায়ে বিভিন্ন অনপেক্ষ প্রতিবর্তনের মধ্যে ঘটতে থাকে বিভিন্ন যোগাযোগ। যে ধরনের প্রতিবর্তন গোড়া থেকেই মজুত থাকে না এবং গ'ড়ে ওঠে দুই বা ততোধিক অনপেক্ষ প্রতিবর্তনের সমন্বয়ে তাদেরই বলা হয় সাপেক্ষ প্রতিবর্তন বা conditioned reflex। এই জাতীয় প্রতিবর্তনের মাধ্যমেই শিশু লোক বা জিনিসের পরিচয় শেখে, ভাষার ব্যবহার করতে পারে এবং বয়স্কদের বিভিন্ন কার্যকলাপ অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। শুধু দেখতে পারাটা একটা মৌলিক সংবেদনের জন্ম অর্থাৎ অনপেক্ষ প্রতিবর্তনের ফল; আর তার পরিচয় বা নাম শেখাটা হচ্ছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তন-সঞ্জাত—দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুটি অনপেক্ষ প্রতিবর্তনের সমন্বয়ে এর উদ্ভব। একটা গরম জিনিসে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়াটা অনপেক্ষ প্রতিবর্তন; আর হাত না দিয়ে, শুধু দেখেই বা 'গরম' কথাটা শুনেই হাত সরিয়ে নেওয়াটা হচ্ছে সাপেক্ষ প্রতিবর্তনের উদাহরণ।

এইভাবে, যত বেশী সাপেক্ষ প্রতিবর্তন গ'ড়ে ওঠে গুরুমস্তিষ্কের অধ্যঙ্গ এলাকার (association area) ক্রমোন্নতির মাধ্যমে, শিশুর মানসিক বিবর্তন তত বেশী এগিয়ে যায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়োজনে কতকগুলো সাপেক্ষ প্রতিবর্তন আপনা থেকেই গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু বয়স্কদের দ্বারা এই জাতীয় প্রতিবর্তনের সম্যক্ এবং সচেতন ব্যবহারের সাহায্যে শিশুর শিক্ষা সুষ্ঠু ধারা অনুসরণ ক'রে গ'ড়ে উঠতে পারে।

কখন ভালভাবে শেখানো যায়?

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তন-প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন শিশুর বিভিন্ন সংবেদনক্ষমতা ভালভাবে গ'ড়ে উঠেছে। সুতরাং শিশুর মানসিক বিবর্তনের অনুধাবনে তার সংবেদন-সমূহের বিশদ আলোচনা অপরিহার্য।

জন্মসময়েই শিশুর মধ্যে কতকগুলো স্থূল সংবেদনশীলতা দেখতে পাওয়া যায়, যদিও নির্দিষ্ট-স্থান-ধর্মী সংবেদন খুব সামান্যই থাকে। ব্যথা, উত্তাপ, স্পর্শ এবং ভারসাম্যের সংবেদন বেশ ভালভাবেই থাকে। ঘ্রাণ এবং আস্বাদন শক্তিও জন্মসময়েই থাকে; তবে দু'তিন মাস বয়সের মধ্যে আস্বাদন-ক্ষমতা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। বোতলে দুধ খাওয়ানো হলে যতটা মিষ্টি সাধারণতঃ মেশানো হয়, তার চেয়ে কম হলে এই সময় থেকেই শিশু রীতিমতো আপত্তি জানাতে থাকে। পারিপার্শ্বিককে জানবার এবং বোঝবার দিক্ থেকে এই পর্যায়ে শিশুর একমাত্র পন্থা সমস্ত কিছুকে মুখবিবরে চালান দিয়ে পরখ করা। এটা যে তার ক্ষেত্রে বদভ্যাস নয় বরং একটি মৌলিক প্রতিবর্তন, সেটা বয়স্কদের জানা অবশ্য প্রয়োজন। কারণ, অনেক সময়েই দেখা যায় তাঁরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী শিশুকে অতি দ্রুত সুসভ্য করবার চেষ্টা করেন; এবং শিশুর মানসিক বিবর্তনে তার ফল খুব ভাল হয় না। অন্যান্য সংবেদনগুলো ভালভাবে বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে মুখকেই একমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার 'অভ্যাস' সুস্থ এবং স্বভাবী শিশু আপনা থেকেই কমিয়ে আনে এবং পরে বর্জন করে।

অন্যান্য সংবেদনের মধ্যে, দৃষ্টিশক্তি জন্মসময়ে কেবলমাত্র আলো এবং অন্ধকারকে আলাদা ক'রে বোঝবার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—জোরালো আলোতে চোখের মণি সংকুচিত হয় এবং চোখের পাতা বুজে আসে। প্রায় একমাস বয়সের সময় শিশুর দৃষ্টি যে কোনও উজ্জ্বল জিনিসকে অনুসরণ করতে পারে; কোনও অস্বাভাবিক (অর্থাৎ শিশুর কাছে নতুন) শব্দ হলে সেইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং

চোখের খুব কাছে কোনও জিনিস নিয়ে গেলে সে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে। তিনমাস বয়সে শিশু তার দুধের বোতল এবং অন্যান্য ধারে-কাছের জিনিস চিনতে পারে; চোখের বিভিন্ন চালচলনের মধ্যে মোটামুটি একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, অর্থাৎ এগুলো আর আগের মতো তত এলোমেলো এবং অর্থহীন মনে হয় না। পাঁচ-ছ' মাস বয়স থেকেই দৃষ্টিগত সংবেদনী আবেগসমূহ (impulses) গুরুমস্তিষ্কে সঞ্চিত হতে থাকে এবং এরই মাধ্যমে শিশু অভ্যাসের পর্যায় থেকে স্মৃতিশক্তির পর্যায়ে আসে—দেখা লোক এবং জিনিসগুলকে শিশু আরও বেশী ক'রে এবং আরও ভালভাবে চিনতে পারে। প্রায় এই বয়সেই শিশুর ভীতি-সংক্রান্ত প্রকোভন্ত প্রতিক্রিয়ার (emotional response) একটা বাঁধাধরা ছক দাঁড়িয়ে যায়—অপরিচিত লোক এবং অদ্ভুত জিনিস দেখলেই শিশু কান্না জুড়ে দেয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকদিন পরেই শিশুর শ্রবণশক্তি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়; বিশেষ ক'রে উচ্চগ্রামের শব্দ শুনলে শিশু চমকে ওঠে। মাস চারেক বয়স থেকে শিশু বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারার মতো অবস্থায় আসে। এই সময় থেকেই ঘুমপাড়ানি গান এবং বিভিন্ন সঙ্গীত তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে।

শ্রবণশক্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বরযন্ত্রের পেশীসমূহ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে থাকে এবং স্বরযান্ত্রিক অনপেক্ষ চেষ্টায় প্রতিবর্তনসমূহের অগ্রগতির ফলে শিশু বিভিন্ন শব্দ করতে পারে। এক বিশেষ পর্যায়ে এই দুটি সংবেদনী এবং চেষ্টায় প্রতিবর্তনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়; এবং শিশু যে সমস্ত শব্দ শোনে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করে। চোয়াল, জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের প্রতিবর্তনসমূহ ভালভাবে গ'ড়ে উঠলে—অর্থাৎ শিশু তার চোয়াল, জিভ এবং ঠোঁট নানারকমভাবে-নাড়তে-পারার পর্যায়ে এলে—স্বরযন্ত্রের পেশীসংকোচন ক্ষমতা, শ্বাসযন্ত্রের প্রক্রিয়া এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের সঞ্চালনের সমন্বয়ে শিশুর বাক্‌শক্তি দ্রুত বিকাশ লাভ করে। জিহ্বা এবং ওষ্ঠসঞ্চালনের ক্ষেত্রে বয়স্কদের সমাক্ অনুকরণের জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারও প্রয়োজন; কিন্তু শ্রবণশক্তি না থাকলে শব্দের বিভিন্নতা সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক কোনও ধারণাই জন্মায় না, এবং তার ফলে অন্যান্য সমস্ত যন্ত্রের কার্যকলাপ ঠিকভাবে গ'ড়ে উঠলেও শিশু হয় বাক্‌শক্তিহীন।

বুদ্ধির বিকাশ

শিশুর মানসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে বাক্‌শক্তির উদ্ভব একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়; কেননা, শিশুর 'মন' কতখানি গ'ড়ে উঠেছে, সে কতখানি 'বুদ্ধি'র অধিকারী হয়েছে, কিংবা তার প্রক্ষোভজ (emotional) বিবর্তন বা কতটা এগিয়েছে এ সমস্ত প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব শিশুর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী এবং চোখমুখের ভাব থেকে পাওয়া গেলেও, নিশ্চিত উত্তর পেতে গেলে শিশুর 'কথা'র উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। অবশ্য শিশুর কতখানি বুদ্ধিগত অগ্রগতি হয়েছে তার পরিমাণ করতে গেলে, শিশু কতবেশী কথা কত পরিষ্কার-ভাবে উচ্চারণ করতে পারছে সেই বিচারের উপর খানিকটা নির্ভর করলেও তার চেয়েও বেশী ক'রে দেখা দরকার শিশু কত বেশী জিনিস চিনতে পারছে এবং তাদের উল্লেখ করতে গিয়ে সঠিক শব্দ সংকেতটি ব্যবহার করতে পারছে।

শিশুর বুদ্ধিগত বিবর্তন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে হলে, 'বুদ্ধি' বলতে আমরা কী বুঝি সেটা আগে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে, অনুষংগমূলক স্মৃতিশক্তি বা associative

memory-কেই বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এই ধরনের বুদ্ধি মনোবিদ্যার পরিভাষায় formal intelligence বা মেধা বলা হয়। পারিপার্শ্বিকে বিভিন্নভাবে চেনবার এবং ব্যবহার করবার দিক্ থেকে এবং লেখাপড়া শেখবার ব্যাপারে এর স্থান গুরুত্বপূর্ণ—যে সব শিশুর ভিতর এই 'মেধা' যত বেশী বিকশিত তারা তত তাড়াতাড়ি কথা শেখে, সঠিক শব্দ সংকেত ব্যবহার করতে পারে এবং বিভিন্নভাবে বড়দের নকল করতে আরম্ভ করে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এরা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারে এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী জিনিস দীর্ঘকাল মনে রাখতে পারে।

কিন্তু শুধু মেধার মধ্যেই 'বুদ্ধি'র ধারণাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। মনোবিদ্যার পরিভাষায় contentional intelligence বা 'বিচারগত বুদ্ধি' নামে আর একজাতীয় বুদ্ধির ধারণা পাওয়া যায়, যাকে সোজা কথায় আমরা 'সাধারণ বুদ্ধি' বা কাণ্ডজ্ঞান (common sense) ব'লে থাকি। সাধারণ বুদ্ধি যাদের বেশী থাকে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে, পারিপার্শ্বিককে বিচার ক'রে তার ভিতর পরিবর্তন আনবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার করতে পারে। ব্যক্তিত্বের বিকাশও এদের মধ্যে অনেক বেশী হয়।

মেধা এবং বিচারগতবুদ্ধি উভয়ের ভিত্তিই বস্তুগত। শিশুর মানসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এতক্ষণ যে সমস্ত বিভিন্ন দিক্ আমরা আলোচনা করেছি তাদেরই সমন্বয়ে বুদ্ধির বিকাশ; সুতরাং শিশুর মানস-বিবর্তনের তুঙ্গে অবস্থিত বুদ্ধিও কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তা নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিশুর মানস-অভিব্যক্তির ধারাকে আমরা এখন পরপর সাজাতে পারি: নাভীয় জটিলতাবৃদ্ধির মারফৎ বিভিন্ন ধরনের সংবেদনের জন্ম; সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চেষ্টায় বিবর্তনের ফলে নানাধরনের কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে বস্তুজগতের সঙ্গে ক্রমশঃ বেশী ক'রে যোগাযোগ; এদের উভয়ের সমন্বয়ে এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তনের সাহায্যে প্রথমে প্রত্যক্ষ (perception) ও পরে ধারণার (concept) উদ্ভব এবং ভাষার সার্থক ব্যবহার; অনুষংগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষগত এবং ধারণাগত স্থায়িত্ব অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির বিকাশ; বাস্তব জগৎকে অনুসরণ ক'রে প্রত্যক্ষ এবং ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে 'বিচার' বা judgment-এর আবির্ভাবে চিন্তাশক্তির স্ফুরণ; এবং পরিশেষে এক বা একাধিক বিচার থেকে আর একটি বিচারে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অর্থাৎ যুক্তিবৃত্তির অভ্যুদয়ের মাধ্যমে চিন্তাজগতের সম্পূর্ণতা সাধন। শিশু বলতে যাদের আমরা সাধারণতঃ বোঝাই তাদের মধ্যে এই শেষোক্ত বৃত্তি আরম্ভ হয় মাত্র; সেইজন্যে শিশুর মানসিক বিবর্তনের বর্ণনায় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আর করা হ'ল না।

আমি ও আমার মন

॥ তিন ॥

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, এম. এ. *

মনের কথা বলতে বলতে আমরা বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছি। এবার মনের মাধ্যমে আমাদের অন্তর্জগতে যে সকল কাজ অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘ'টে চলেছে তাদের এক এক ক'রে পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এই "মানস-ব্যাপার"গুলো যে ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুতপরিবর্তনশীল, আর মন যে অতি সূক্ষ্ম বস্তু—এত সূক্ষ্ম যে তাকে অণু পরিমাণ বলা হয়—এ সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে পূর্বপ্রকাশিত দুটো প্রবন্ধে † বলার চেষ্টা করেছি। অন্তর্জগতের ঘটনাগুলো পাশ্চাত্য মনোবিদেরা যে রকম 'thinking' 'feeling' 'willing' ইত্যাদি প্রকারে ভাগ ক'রে আলোচনা ক'রে থাকেন, ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণও তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিভাগ ও স্বরূপ বিচার করেছিলেন। তবে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ঐ ঘটনাগুলোকে 'মনের কাজ' ব'লে বর্ণনা করবেন, কিন্তু নৈয়ায়িক এখানে একটু কুণ্ঠা অনুভব করতে পারেন। কারণ, তাঁর মতে এগুলো মনের সাহায্যে সম্পন্ন হলেও মন এখানে কর্তা নয়—চিনির বলদের মতো সে শুধু কাজ ক'রে চলে; আর কাজগুলো তাদের নিজ নিজ ফল সমেত 'আমি' পদবাচ্য আত্মার অধিকারে পড়ে। অবশ্য, এক হিসাবে তারা 'মনেরই কাজ' এ কথা বলা যেতে পারে—যেমন রামবাবুকে অফিসে যে কাজ করতে হয় তাকে 'রামবাবুর কাজ'ও বলা হয়, যদিও কাজটি আসলে সেই কোম্পানির অথবা তার অধিকর্তার।

জ্ঞান-সংস্কার, সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ-যত্ন, ধর্ম-অধর্ম এই কয়টিকে আত্মার 'বিশেষ গুণ' বলা হয়েছে। এদের মধ্যে ধর্ম ও অধর্মকে বাদ দিয়ে বাকীগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে ন্যায়বৈশেষিক আচার্যদের যে বিস্তারিত আলোচনা তা সংক্ষেপে সাধারণভাবে উপস্থাপিত করা হলে, প্রাচীন ভারতীয়দর্শনে তথাকথিত মনোবিদ্যার আলোচনার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ ধারণা করতে পারব।

প্রথমে বুদ্ধির বা জ্ঞানের কথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক। কারণ, জ্ঞান এক হিসাবে অন্তর্জগতের প্রাথমিক ব্যাপার ব'লে ধরা যেতে পারে। শিশুকাল থেকেই আমরা বাহ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত হই। এই পরিচয় জ্ঞানসমষ্টিরই নামান্তর মাত্র। জ্ঞান বা বোধকে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে একটা ব্যাপকতর এবং প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে কোনও ধরনের বোধ বা প্রতীতিকেই জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানের ঠিক স্বরূপটি কী? এ প্রশ্নের জবাবে জ্ঞানেরই সমার্থক কতগুলো শব্দ ব'লে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না ব'লে সে প্রয়াস না করাই ভাল। তবে, জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারভেদের পর্যালোচনার মধ্যেই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপটি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ব'লে আশা করা যায়।

প্রশস্তপাদাচার্য প্রথমে জ্ঞানকে সংক্ষেপে 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' এই দুই ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন। এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যা বলতে বেদান্তদর্শনের 'বিদ্যা' 'অবিদ্যা' শব্দে যা বোঝায় তা বুঝলে

* উপাধ্যায়, সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা

† মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮, এবং বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৯, সংখ্যা দ্রষ্টব্য

চলবে না। অথবা সাধারণ বুদ্ধিতে 'চুরি বিদ্যে' একটা অবিদ্যা, ঘুষ নেওয়া একটা অবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবিদ্যা যে-ভাবে বিদ্যার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার হয় সে-ভাবের অর্থ গ্রহণ করলেও চলবে না। এখানে সাধারণভাবে অসন্দিগ্ধ ও অবাধিত (uncontradicted) জ্ঞানকেই বিদ্যা ব'লে ধরা হয়েছে। যে-জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক এবং দেশ কাল ও অবস্থা ভেদেও যে-জ্ঞান 'বাধিত' হয় না অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় না তাকেই 'বিদ্যা' বলা যাবে। আর বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞানকে অবিদ্যা শব্দে বোঝা মোটেই শক্ত নয়। অবিদ্যাকে মুখ্যতঃ চারভাগে ভাগ ক'রে দেখানো হয়েছে; এগুলোর আলোচনা করলেই অবিদ্যার স্বরূপটি স্পষ্ট হবে।

প্রথম প্রকারের অবিদ্যা 'সংশয়'। সন্দেহ বা সংশয় এক প্রকার জ্ঞান মাত্র। "বিমর্শ"কে সংশয়ের স্বরূপ বলা হয়েছে। 'বিমর্শ' অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধরূপে কোনও বস্তুর জ্ঞান হওয়া। [বি (বিরোধী) + মৃশ্ (জ্ঞান)] একই বস্তু যখন পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার রূপে জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, তখনই হয় সংশয়ের উৎপত্তি। দূর থেকে অল্প আলোয় দীর্ঘাকৃতি কোনও বস্তুপিণ্ড দেখে মনে হতে পারে 'এটা কী'? 'এটা' বলতে ঐ বস্তুপিণ্ড যেটা সামনেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থিত তাকেই বোঝায়। নৈয়ায়িকের পরিভাষা অনুসারে এটার নাম দেওয়া যাক 'ধর্মী'। আর ঐ 'কী'র রহস্যের চাবিকাঠি খুললে দেখি ওর মধ্যে দুই বা তার বেশী পরস্পরবিরোধী ধর্মের সমাবেশ—যথা 'এটা কি মানুষ না গাছের গুঁড়ি'। এই হ'ল সাধারণভাবে সংশয়ের আকার। সংশয়ের মধ্যে একটা দোদুল্যমান (oscillation) ভাব থাকে। মানুষ হওয়া আর গাছের গুঁড়ি হওয়া দুটো পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনা। ঐ বস্তু—যাকে 'ধর্মী' নাম দিয়েছি—যদি সত্যই মানুষ হয় তবে গাছের গুঁড়ি হতে পারে না, আর গাছের গুঁড়ি হলে তো মানুষ হবার কথাই ওঠে না। সংশয়ের 'দোলা' ওই ধর্মীকে আশ্রয় ক'রে এই দুটি বিরুদ্ধ ধর্মের সম্ভাবনার মধ্যেই চলাচল করে। এই 'দোলা'টি সংশয়ের নিজস্ব, এবং অন্য জ্ঞান থেকে তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

সংশয়ের কারণ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করলে কতকগুলো বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই 'ধর্মী'তে বিপরীত ধর্মের সম্ভাবনা কেন দেখা যায়? সংশয়ের ক্ষেত্রে দূরত্ব নিবন্ধনই হ'ক, আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়টির সম্পর্কের পথে কোনও অসুবিধার জন্যই হ'ক, অথবা অন্য কোনও অ-দৃষ্ট কারণ বশতঃই হ'ক, বস্তুটি যথাযথরূপে প্রকাশ পায় না। ধর্মীটির সঙ্গে আমরা যতটুকু পরিচিতি লাভ করি ততটুকুর সাহায্যে তার যথার্থস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। সাধারণতঃ আমরা যখন কোনও নতুন বস্তুর পরিচয় লাভ করি, তাকে পূর্বপরিচিত বস্তুসমূহের কোনও না কোনও একটির শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা ক'রে থাকি। প্রসিদ্ধ বা পূর্বজ্ঞাত যে বস্তুর সঙ্গে নবপরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য অত্যধিক তাকে সেই পর্যায়ভুক্ত করার দিকেই আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু যখন কোনও বস্তুর সঙ্গে পরিচিতির পরিমাণটা এতই অল্প এবং এমনভাবে সম্বদ্ধ যে তার সঙ্গে আমাদের 'প্রসিদ্ধ' বা জানা একাধিক বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজে পাই, অথচ এমন কোনও বিশেষ ধরনের পরিচয় পাই না যাতে তাকে কোনও বিশেষ একটির পর্যায়ভুক্ত করতে পারি তখনই হয় সংশয়ের সূত্রপাত। নৈয়ায়িকেরা বলেন—একাধিক বস্তুর মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম (common property) তার বোধ হয়েছে, কিন্তু কোনও বিশেষ ধর্মকে জানা হয় নি এমতাবস্থায় সাধারণ ধর্মবোধের ফলে সেই সব একাধিক বস্তুর স্মরণ হয় আর তার থেকেই সংশয়ের উৎপত্তি হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পূর্বার্জিত সংস্কার না থাকলে যেমন স্মরণ হতে পারে না, তেমন সংশয়ও হতে পারে না। শিশুর প্রাথমিক জ্ঞানে তা হলে সংশয় থাকতে পারে না। প্রশস্তপাদাচার্য সংশয় উৎপত্তির

প্রতি 'অধর্ম'কেও অন্যতম কারণ বলেছেন। 'অধর্ম' বলতে বিশেষ 'অ-দৃষ্ট', অর্থাৎ সাধারণ অর্থে পূর্বানুষ্ঠিত কর্মের ফলকেই বোঝায়। যদিও সংশয় 'বিদ্যা' বা সত্যজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয় ব'লে তার কারণ হিসাবে 'অধর্ম'কে নির্দেশ করতে হয়েছে, তবুও কথাটা আরও একটু গভীরভাবে বুঝে নিতে পারা যায়। পূর্ব-সঞ্চিত কর্মের অথবা অভিজ্ঞতার ফলসমূহ যা আমাদের আত্মাকে আশ্রয় ক'রে বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যা দিয়ে আমাদের অন্তর্জগৎ তৈরি হয়, তাও আমাদের সংশয়ের উৎপত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ বিচারবেদ্য—প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে না; তাই সেখানে 'অধর্ম' বা 'অ-দৃষ্ট' কারণের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু "দৃষ্টে সতি নাদৃষ্টম্" এই ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ দৃষ্ট বা জ্ঞাত কারণ বর্তমান থাকলে অজ্ঞাত বা 'অ-দৃষ্ট' কারণ কল্পনা অনুচিত এই নিয়ম অনুযায়ী যেখানে জ্ঞাত কারণ নির্দেশ করেই ব্যাখ্যা সম্ভব হবে, সেইখানে অতখানি বেশী অ-দৃষ্টের আশ্রয় নিতে হবে না। যেখানে দূরত্ব, স্বল্পপরিচিতি প্রভৃতি সংশয়ের প্রসিদ্ধ কারণকলাপ সেরকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ ব্যক্তিবিশেষের চিত্ত কোনও বস্তুর যথার্থরূপ সম্পর্কে সন্দিহান, সেখানে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তির কর্মার্জিত ফল বা অভিজ্ঞতার ফল—যা এখন তার প্রকৃতির মধ্যেই স্থান লাভ করেছে—তার নিশ্চয় জ্ঞান লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সংশয়ের হেতু হয়ে উঠছে। আজকাল কাউকে অত্যন্ত সাধু বা অতিমাত্রায় ভক্তিবিহ্বল দেখলেই আমরা তার সাধুতায় বা ভক্তিতে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকি; ভাবি এটা আসল না নকল। এই সংশয়ের পিছনে আছে বর্তমান জগতে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। আর সংশয় যখন কারও মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়, তাকেও বলা যেতে পারে এই 'অ-দৃষ্টে'র পরিহাস।

প্রশস্তপাদাচার্য সাধারণভাবে দুরকমের সংশয়ের কথা বলেছেন—অন্তঃ এবং বহিঃ। অন্তঃ-সংশয়ের দৃষ্টান্ত উপরে ঠিক পূর্ব অনুচ্ছেদের (paragraph) শেষভাগেই দেখানো হয়েছে। ভবিষ্যত বক্তার কোন্ কথা সত্য হচ্ছে আর কোন্‌টা বা মিথ্যা হচ্ছে এই দেখে তার অন্য কথাগুলোর সত্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ তাও এই অন্তঃসংশয়ের পর্যায়ে পড়ে। বহিঃসংশয় প্রত্যক্ষ বিষয়ে হয় এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়েও হয়। প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় সুপ্রসিদ্ধ। পূর্বেই "মানুষ গাছের গুঁড়ি" ইত্যাদি আকারের সংশয়ের মধ্যে তা উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে পরোক্ষজ্ঞান সংশয়াত্মক হতে পারে না। কিন্তু বিষয়টি সংশয়-উৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত অপ্রত্যক্ষ থাকলেও যদি তার সম্পর্কে কারও উপদেশ থেকে সাধারণ জ্ঞান একটু হয়ে থাকে, তবে তাকে আশ্রয় করেও সংশয় জন্মাতে পারে। একেই অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ক সংশয় বলা হয়েছে। এখানেও 'অধর্ম' বা 'অ-দৃষ্ট' কারণ হতে পারে।

সংশয়ের মধ্যে একাধিক পক্ষ বা 'কোটি' থাকে যাদের মধ্যে সংশয়ের দোলা চলতে থাকে। একদল বলতে চান, সংশয়মাত্রই 'দ্বিকোটিক' অর্থাৎ দুটি বিকল্পের মধ্যেই তার গতায়াত। এর মধ্যে একটি ভাববস্তু, অপরটি অভাববস্তু। যেমন 'ওটা আগুন নাকি;' এই সংশয়ের একটি 'কোটি' আগুন—ভাববস্তু, অপর 'কোটি' আগুনের অভাব—অভাববস্তু। যেখানে একাধিক ভাববস্তু সংশয়বোধক বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে—যেমন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলিতে 'ওকি মায়া কি স্বপনছায়া, ওকি ছলনা'; অথবা সংস্কৃত শ্লোকের চরণে "কিমিন্দুঃ, কিংপদ্মং, কিমু মুকুরবিম্বং, কিমু মুখম্" প্রভৃতি ক্ষেত্রে—সেখানে ভাব ও অভাব কোটিযুক্ত একাধিক সংশয়ের সমাবেশ ঘটে এই কথা তাঁরা ব'লে থাকেন। কিন্তু 'বহুভাব কোটিক' সংশয় স্বীকার করলে আর প্রসিদ্ধ সংশয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে এত জটিলতার আশ্রয় নিতে হয় না।

সংশয় বস্তুতঃপক্ষে সত্যজ্ঞানের অগ্রদূত। সংশয় বা সন্দেহ আসে বলেই আমরা সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর হই। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংশয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এই জন্য ন্যায়দর্শনে সংশয়কে 'বিচারের প্রধান পূর্বাঙ্গ' ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্যানুসন্ধানের প্রথম ও প্রধান সোপান হচ্ছে সংশয়, এই তাঁদের অভিমত। কিন্তু এ সব হচ্ছে সুস্থ মনের স্বাভাবিক সংশয়ের কথা। পূর্বসঞ্চিত "অ-দৃষ্ট" কারণ বশতঃ অসুস্থ মনের যে-সংশয় তার কথা স্বতন্ত্র। সে-সংশয় সত্যজ্ঞানলাভের পথে প্রবল প্রতিবন্ধকই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সে-সংশয় ততটা বাহ্যবস্তুসাপেক্ষ নয়, যতটা ব্যক্তি সাপেক্ষ। তার মূল কারণ থাকে সেই ব্যক্তিরই পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা কর্মের ফল, যে 'অ-দৃষ্ট' ও 'সংস্কার বা বাসনা' তার মধ্যে। 'অবিদ্যা'র অন্যান্য প্রকার যেমন 'ভ্রম', 'স্বপ্ন' ও 'অনধ্যবসায়' সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

মনের স্বাস্থ্য

সুবিমল দেব *

সরল-জটিল বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে মানুষের দিন কাটে। মানুষ চায় যথাসম্ভব কম সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে সুখী হতে। কিন্তু এ তার ইচ্ছে মাত্র। এ সব সমস্যার উদ্ভব যেখান থেকে হয় অর্থাৎ সমাজের গঠনব্যবস্থা তার উপর ব্যক্তিমাত্রের এককভাবে কোনও হাত নেই।

এই সমস্যাসঙ্কুল সমাজবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে মানুষের মনে অহরহ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সব রকম সমস্যায় বাস্তবানুগত হতে গিয়ে স্বপ্নমুখী মনকে ক্ষত করতে হয় বারবার। তবুও সামাজিক নিয়মের বাইরে পা ফেলবার উপায় নেই। মনের স্বাভাবিক গঠন অনুযায়ী সকলের সুষ্ঠুভাবে সব জিনিস পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, নিজের মন-মতো ক'রে পাওয়ার একটা অভিলাষ আছে। এই আকাঙ্খা বা অভিলাষ যে সব সময় উঁচু স্তরের তা নয়। তবে সে যে স্তরেরই হ'ক তা পূরণ করতে আমাদের বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে হয়।

অনেক সময় আমরা এই ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচবার জন্য বাস্তবকে এড়িয়ে চলতে চাই। ভাল লাগে অগোছাল হতে, খামখেয়ালীপনাকে প্রশ্রয় দি, অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ক'রে আনন্দ পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খুব কঠিন একটা অঙ্ক কষতে গিয়ে অনেকক্ষণ মাথাঘামানোর পর অতি বিচক্ষণ লোককেও তার উপর বেপরোয়া হিজিবিজি টেনে ফের নতুনভাবে অঙ্ক সাজাতে অনেক সময় দেখা গেছে। অনেকে সমস্যার সমাধান করতে ব'সে আর পেরে না উঠে তাতে গুরুত্ব আরোপ করা ছেড়ে দেয়। এই ভাবে নানান কঠিন বাস্তব সমস্যা মানুষকে বাস্তব-বিমুখ ক'রে দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন করে, তাকে বদরাগী ও নিরাশাবাদী ক'রে তোলে।

এই ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজের ব্যক্তিত্বে ব্যর্থতা এবং সহনশীলতার (frustration tolerance) একটা মান (level) থাকা দরকার। এই মান যার যত সুগঠিত এবং উঁচু স্তরের তার মনের দিক্ থেকে বিধ্বস্ত হবার সম্ভাবনা তত কম। মানুষকে এটা কষ্ট ক'রে অর্জন করতে হয়। মনোবিদেরা বলেন সমাজশিক্ষার একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয়তা হ'ল এই মান সব রকম অবস্থায় সুদৃঢ় রাখতে সাহায্য করা। এর জন্য সব রকম সম্ভাব্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনকে প্রবাহিত হতে দেওয়ার জন্য মনের প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। সমস্যার সাংঘাতিক আঘাতে মন বিধ্বস্ত হয়ে যাবার ভয়ে, কখনও পেছিয়ে থাকা উচিত নয়। এতে মনের স্বাস্থ্য সুস্থভাবে গঠিত হতে পারে না। কয়েকবার কঠিন বাস্তব-পরাস্ততায় সহনশীল হতে পারলেই এর মান অনেকটা উঁচু হয় এবং মনের সবল স্বাস্থ্য গঠন হয়। পিতামাতার উচিত শিশুদের মনে শৈশব থেকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া।

সাধারণতঃ দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কম স্বাস্থ্যবান-মনের মানুষ বাস্তব-নিষ্পেষিত (frustrated) মনের ক্ষত উপশম করতে গিয়ে, সমাজের বেড়াজালের বাইরে আসার চেষ্টায় পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বন

* উপদেষ্টা, বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

করে। এর জন্য অনেক রকমের সুযোগ মানুষ খুঁজে নেয়, যা সামাজিক আইন অনুগত এবং একটা মানদণ্ডের মোটামুটিভাবে গ্রহনীয় প্রান্ত থেকে একেবারে গ্রহনীয় নয়, এমন কি মারাত্মক অবস্থা পর্যন্ত। তবে প্রথম প্রথম মানুষ এ সব বৃত্তি গ্রহণ করে সজ্ঞানে এবং ক্রমশঃ তার উপর অধিকার হারায় এবং নির্জ্ঞান মন দ্বারা চালিত হয়।

বাস্তব-নিষ্পেষণে বিক্ষত মনকে সাময়িক নিবৃত্তি দেওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন পথের আশ্রয় নেয়—যেমন দিবাস্বপ্ন, একাকীত্ব, পরিণয়, খেলার ঝোঁক, ছবি তোলার ঝোঁক থেকে আরম্ভ ক'রে অল্পসল্প নেশা, শারীরিক অসুস্থতার দোহাই, পরে উদাসীনতা এবং সর্বশেষে মানসিক রোগ। সাধারণভাবে আশ্চর্য মনে হলেও এ কথা ঠিক যে মানসিক রোগ বাস্তবের পেষণ থেকে মুক্তি পাবার একটা উপায় এবং মানুষ এটা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করে। যখন সম্ভাব্য সব রকম আইন অনুগত পথ তার অনুসরণ করা শেষ হয়ে যায় তখন সে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে; এতে সুবিধা এই যে তাকে আর সমাজের রীতিনীতির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হয় না। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত লঘু ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির আরও কয়েকটি উদাহরণ নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

অল্পবিস্তর দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে দিন কাটাতে অবশ্য সকলেই পছন্দ করেন এবং এর প্রয়োজনও আছে। কিন্তু সজ্ঞানে এর মধ্যে ঢুকে যদি আর এর প্রকোপ থেকে বের হওয়া না যায়, অর্থাৎ এই দিবাস্বপ্নে গা ভাসিয়ে দিয়ে যদি বাস্তবের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে হয় এবং দিবাস্বপ্ন ক্রমশঃ নির্জ্ঞান মন দ্বারা চালিত হয় তবে তা মানসিক রোগের পর্যায় পড়ে।

মনকে কিছুটা হাল্কা করার জন্য অবশ্য কিছু কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেওয়া অস্বভাবী নয়। কিন্তু এটা অস্বভাবী হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন সে-আগামীকাল আর কখনও আসে না। সোজা-সুজি বলতে গেলে সে-কাজ কিছুতেই একই অজুহাতের জন্য শেষ হয় না। আগামীকালের জন্য কাজ রাখতেই হয়, কিন্তু তা একটা মাত্রা পর্যন্ত এবং এই মাত্রাজ্ঞান মনের সুস্থতা এবং দৃঢ়তার উপর আপেক্ষিক।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সর্বদা পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন। পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। মাত্রাভেদে এই সম্পর্ক যদি কোনও ব্যক্তির একেবারেই না থাকে অথচ থাকার প্রয়োজন আছে, তা হলে এই অবস্থাকে বাস্তব-নিষ্পেষণের ভয়ে পলায়নী মনোবৃত্তি বলেই ধ'রে নেওয়া হবে। অনেকে শেষোক্ত কারণে এই বৃত্তি বেছে নেন। দেখা যায় কোনও একটা কঠিন আঘাতের পর অর্থাৎ বাস্তব জগতে ব্যর্থতায় নিষ্পেষিত হয়ে পড়াশোনার মাত্রা এত ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন যে নাওয়া-খাওয়ার সময় পান না, বাইরের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এক রকম বন্ধ। এই অবস্থা বেশীদিন চললে বাস্তববিমুখতা থেকে মানসিক রোগে গড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

এটা কারও অজানা নয় যে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা কিংবা অন্য কোনও সামাজিক কারণে নিজেকে বাস্তব পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেকে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

আরও একটি পলায়নের পথ হ'ল কোনও জিনিসই মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ না করা, কিংবা উড়িয়ে দেওয়ার একটা মনোভাব।

অনেকে বাস্তব-নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘন ঘন বাড়ি বদল, যাযাবর বৃত্তি, কাজ-বদল ইত্যাদি ক'রে থাকেন। আপাতভাবে তাদের ধারণা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুঝি অবস্থার উন্নতি

হবে। আসলে তারা সাময়িক নতুনত্বের ও পরিবর্তনের জন্য আগ্রহশীল এবং তার চাইতেও বেশী আগ্রহশীল বাস্তব এড়িয়ে চলায়।

বাস্তবনিষ্পেষণে আহত এমন অনেকে বিয়ে করলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, নানা দিকের ভীষণ চাপের মধ্যে থেকেও বিয়ে করে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং পরে অনেককে বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা অহেতুক মনোমালিন্যে দিন কাটাতে দেখা যায়। অন্যদিকে আজীবন অবিবাহিত থাকার অটুট সঙ্কল্পও কিন্তু বাস্তব-পেষণের ভয় ও দায়িত্ব এড়ানোর ইচ্ছে থেকে আসে।

ধর্মকর্ম, দানধ্যান, অলৌকিকত্বে হঠাৎ বেশী পরিমাণ বিশ্বাসী হওয়াও, বাস্তবকে ভুলে থাকার চেষ্টার নামান্তর। দায়িত্ব এড়ানোই এর মূল কারণ। যেহেতু এ রকম মনোভাব সমাজে সৎ বলে স্বীকৃত, অনেকে বাস্তবপেষণ থেকে গা ঢাকা দেবার জন্য এ সব আশ্রয়ের অড়ালে আত্মগোপণ করে। পক্ষান্তরে এটা এক ধরনের কঠোর-সমাজবেষ্টনীর থেকে বেরিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত লঘু সমাজবেষ্টনীতে এসে পড়া। এখানে রুটি ও রুজির দায়িত্ব কম।

সর্বশেষে বাস্তব এড়াতে গিয়ে নেশা করা এবং মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একেবারে দায়মুক্ত হবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সাময়িকভাবে কিংবা বরাবরের জন্য হ'ক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের হাজার দুঃখদ্বন্দ্বে জড়িত মনকে কিছুটা সুখ ও নিবৃত্তি দেবার জন্য সকলেরই এক-আধটা পলায়নের পথ অনুসরণ করার যথার্থতা রয়েছে। এটা স্বভাবী মনুষ্যধর্মের মধ্যে পড়ে এবং এর সৃষ্টি সাময়িকভাবে মানুষকে শান্তি দেবার জন্যেই।

প্রত্যেক মানুষেরই মনের সঙ্কটময় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা দরকার। ডক্টর ভন্ প্রমুখ কয়েকজন আমেরিকান সমাজবিৎ এর জন্য কতকগুলো পথ নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। মনের স্বাস্থ্য গ'ড়ে তোলার জন্য এই সূত্রগুলির প্রচুর অনুশীলন দরকার।

Wayland F. Vaughan. Personal Social Adjustments. The Odyssey Press, New York, 1952.

অর্থের অর্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., এল্ এল্. বি. *

অর্থবিদ্যার বইতে অর্থের (money) পরিচ্ছেদে অর্থের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে একটি ইংরেজী কবিতাংশ উদ্ধৃত দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হল :—

"Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ অর্থের মোটামুটি চার রকম ব্যবহার : বিনিময়ের বাহন, মূল্যের পরিমাপন, মান নির্ণয়ন ও সঞ্চয়ন। অর্থবিদ্‌দের অর্থের এই চার প্রকার ব্যবহারই শুধু জানা আছে। আমরা সাধারণ মানুষও জানি : টাকার দরকার জীবনযাপনের প্রয়োজনায় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। কিন্তু মনঃসমীক্ষকেরা অর্থের আরও গূঢ় ব্যবহারের সন্ধান পেয়েছেন। সে-ব্যবহার সামাজিক মানুষেই ক'রে থাকে, কিন্তু সে-ব্যবহারের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারণ, অর্থের এই গূঢ় ব্যবহার ও মূল্যায়ন নির্জ্ঞান মনের ব্যাপার এবং নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে আমরা সকলেই অনবহিত। বলতে পারেন : 'মনঃসমীক্ষকদের সকল বিষয়েই উদ্ভট কিছু বলা চাই। অর্থের প্রয়োজন সকলেরই আছে এবং তার ব্যবহার কে না জানে? তার আবার গূঢ় বা অজ্ঞাত ব্যবহার কী থাকতে পারে? এ সব মনঃসমীক্ষদের বাড়াবাড়ি।' বাড়াবাড়ি ঠিকই, কিন্তু তা মনঃসমীক্ষকের নয়। অর্থ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সামাজিক ব্যক্তিরাই ক'রে থাকেন। আর এই বাড়াবাড়িই ইঙ্গিত করে অর্থের কোনও গূঢ় পরিচয়ের। কথায় বলে, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।' অতি কিছুরই শোভন নয়। কিন্তু অর্থের ব্যাপারে কয়েক ক্ষেত্রে এমন অতিশয়তা লক্ষ করা যায় যা অর্থের ব্যাপারে ব্যক্তির অস্বভাবী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। ক্রোড়পতিকে দেখা যায় দিনরাত্র বাড়িতে গামছা প'রে থাকতে। কেউ দেখা করতে এলে জানলার কাছে এসে ঘরের ভিতর থেকে কথা বলেন এবং হাত দিয়ে গা কচলাতে থাকেন। ভাবটা এই—তিনি এই মাত্র গামছা পরেছেন স্নান করবেন ব'লে ; এখন গা কচলে তেল মাখছেন। কিন্তু লোক চ'লে গেলেও তিনি স্নান করেন না। আবার কেউ এলে, আবার ঐ একই অভিনয় করেন। আসলে তিনি কাপড়ের বদলে গামছা প'রে কম খরচে সংসার চালাচ্ছেন। কারণ, তার টাকার অভাব তো? তিনি ক্রোড়পতি মাত্র! এই যে অর্থের প্রতি সদা সজাগ-দৃষ্টি একে কি জীবনযাপনের প্রয়োজনে অতি স্বভাবী ব্যবহার বলবেন? অর্থের এই যে অস্বাভাবিক মূল্য বা ব্যবহার, যার কারণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তার কিছু পরিচয় গুরীয় মনোবিদ্যার গবেষণা থেকে এখানে সুস্পষ্ট করতে চেষ্টা করা হবে।

মনঃসমীক্ষণের মতে আর্থিক মুদ্রা 'মলের' প্রতীক। অর্থের সামাজিক ব্যবহার ছাড়াও তার এই প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে মনের গঠন ও প্রকৃতির কিছু খবরও জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে যে কামপ্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল তার আদিমতম অবস্থার সঙ্গে অর্থের প্রতীক-অর্থ জড়িত। শিশু-মনে কামপ্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশ হয় মুখে। মুখের আরাম, স্পর্শ, উষ্ণতা, মিষ্টতা ও

---

* দর্শনশাস্ত্রের উপাধ্যায়, বি. বি, মহাবিদ্যালয়, আসানসোল।

ঘর্ষণের মধ্যেই তখন শিশু জৈবিক চাহিদা ছাড়াও কামপ্রবৃত্তির তৃপ্তি পেয়ে থাকে। তারপর এই কামপ্রবৃত্তি মুখদ্বার থেকে স্থানান্তরিত হয় মলদ্বারে। এই অবস্থায় শিশু মলত্যাগ ক'রে বা মলকে জমিয়ে রেখে মলদ্বারে তীব্র যৌন অনুভূতি ভোগ করে। এ ছাড়াও সে মলকে তখন নিজের দেহের মূল্যবান অংশ ভেবে তাকে সমাদর করতে প্রবৃত্ত হয়। তা ছাড়া প্রিয়জনকে দেওয়ার মতো এইটিই তখন তার একমাত্র মূল্যবান উপহার হয়। প্রিয়জনের অঙ্গে মলত্যাগ করতে পারলে সে তখন খুশী হয়। ভাবে—সে বুঝি প্রিয়জনকে তার বহুমূল্য সম্পদটি দিয়ে যথাযোগ্য সমাদর করেছে। এইটিই শিশুর অপরকে দেওয়া প্রথম বস্তু-উপহার। ফ্রয়েডের মতে : 'His own attitude to the excretions is at the outset very different. His own faeces produce no disgust in him ; he values them as part of his own body and is unwilling to part with them ; he uses them as the first 'present' by which he can mark out those people whom he values especially.'[১]

এই সব কারণ মিলে মল শিশুর নিকট বিশেষ প্রিয় ও কাম্য বস্তু। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে যাই প্রেয়ঃ সমাজ-জীবনে তাই শ্রেয়ঃ নয়। সামাজিক দৃষ্টিতে মল অতি নোংরা ও ঘৃণ্য বস্তু হিসাবে সর্বৈব পরিত্যাজ্য। সমাজের এক জন হিসাবে গৃহীত হতে হলে তাই শিশুকে মল সম্বন্ধে ভাব-ধারণা পরিবর্তন করতে হয়। সামাজিক প্রতিভূ হিসাবে পিতামাতার নিকট থেকেই শিশু মল সম্বন্ধে সামাজিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। পিতামাতা শিশুকে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করতে এবং মল স্পর্শ করতে নিষেধ করেন। মল নোংরা, দুর্গন্ধ, 'ওয়াক থুঃ' ইত্যাদি শিক্ষায় ক্রমে শিশু-মনে মল ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মল ইতিমধ্যে শিশুকে বিভিন্ন সুখ দিয়েছে এবং সেই হিসাবে শিশু-মনে মূল্যবান বস্তুরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই 'মূল্যবান'কে যখন পরিত্যাগ করতে হয় তখন সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য অন্য 'মূল্যবানের' প্রয়োজন হয়। সেই মূল্যবান বস্তুটি এখন সামাজিকভাবে গ্রহণীয় হওয়া চাই। কিন্তু সামাজিক শিক্ষার চাপে শিশুর সংজ্ঞান মনে মল সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মালেও সেই বিষয়ে প্রবৃত্তিবশে একটি অজ্ঞাত আকর্ষণ নির্জ্ঞান মনে থেকে যায়। তাই মলেরই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথচ সামাজিকভাবে গ্রহণীয় বস্তুকে 'মূল্যবান' হিসাবে গ্রহণ করবার এক মানসিক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সেই প্রচেষ্টার কয়েকটি পর্যায় আছে। সর্বশেষ পর্যায়ে ধাতুমুদ্রা 'মূল্যবান' হিসাবে আবির্ভূত হয়। মল থেকে ধাতুমুদ্রায় 'মূল্যবানের' এই ক্রমরূপায়ণটি লক্ষ করলে মল ও আর্থিক মুদ্রার গুপ্ত ঐক্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

কাদামাটির মধ্যেই শিশু প্রথম মলের প্রতিকল্প (substitute) খুঁজে পায়। পরিচ্ছন্নতার পথে মলের গন্ধই শিশুর প্রথম আপত্তিকর ঠেকে। কিন্তু কাদার মধ্যে সে দুর্গন্ধ নেই। অথচ মলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য—আর্দ্রতা, গলগলে ও আঠা আঠা ভাব আছে। এই পর্যায়ে শিশু তাই কাদা দেখলে তৎক্ষণাৎ তাই নিয়ে মেতে ওঠে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, অন্য যে কোনও সুদৃশ্য খেলনা ফেলে সে কাদাকেই বেছে নেয়। কারণ, কাদা মেখে সে মল উপভোগের সুখ মিটিয়ে নিতে পারে। কাজেই কাদাই মলের প্রথম প্রতিকল্প।

কিন্তু কাদা নিয়ে শিশু বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার পরিচ্ছন্নতাজ্ঞান বৃদ্ধির সাথে কাদাও ক্রমশঃ অপরিচ্ছন্নের কোঠায় পড়ে। কারণ কাদা গায়ে ও জামাকাপড়ে আটকে গিয়ে

১ Freud : A General Introduction to Psycho-analysis, p. 276

দেহ ও পরিধেয় নোংরা করে। কিন্তু শিশুর আর নোংরা হাওয়া চলে না। তাই শিশু তখন কাদার বদলে তারচেয়ে আরও পরিশুদ্ধ ও নির্দোষ জিনিস মলের প্রতিকল্পরূপে সন্ধান করে। এখন বালির (sand) মধ্যে সে এই বস্তু খুঁজে পায়। বালির সাথে কাদার আত্মীয়তা আছে অথচ বালি বেশী পরিচ্ছন্ন। বালিতে চ্যাটচেটে ভাব নেই, দুর্গন্ধও নেই। কাজেই শিশু বালির মধ্যে মল উপভোগের সন্ধান পায়। এই সময় শিশুদের বালির প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। বালি দেখলে শিশুরা আগ্রহভরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রবল উৎসাহে তা ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, গা-মাথায় মেখে, তাই দিয়ে নানা জিনিস গড়ে—বালিকে সর্বোতভাবে ভোগ করে। বালি ঘাঁটতে ঘাঁটতে শিশুর সুপ্ত মলকাম (copro-philia) কখনও বা বিশেষভাবে চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন সে প্রতিকল্পের বদলে আসল মলকেই যেন বেশী ক'রে পেতে চায়। এই চাহিদা থেকে শিশুরা বালিতে জল ঢেলে তা কাদায় পরিণত করতে মেতে যায়। কেউকেউ প্রস্রাব ক'রে বালি ভিজিয়ে তাই ঘাঁটতে থাকে। এতে শিশুদের বড় আনন্দ। ভিজে বালি যেন অনেকটা মলের রূপ পায়, শিশু তাই প্রস্রাবের দ্বারা এই বালি ভেজানোর স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা ক'রে থাকে।

কিন্তু 'বালিখেলা'ও বেশী দিন চলে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে পরিচ্ছন্নতার তাগিদ আরও বাড়ে। অভিভাবকেরা ক্রমশঃ শিশুদের ধুলোবালিও নাড়তে নিষেধ করেন। ধুলোবালিও তো গা-মাথা, জামাকাপড় নষ্ট করে। অতএব তাও নোংরা ব'লে পরিগণিত হয়। শিশু তাই বালিও ত্যাগ করে। কিন্তু বালি ত্যাগ মানেই মল-প্রীতির অবসান নয়। মল-প্রীতি মনে সমানভাবেই বর্তমান থাকে। কেবল বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে এই প্রবৃত্তির ভোগের রূপ বদলায়। তাই বালি ছেড়ে অন্যবস্তু আবিষ্কারের তাগিদ দেখা দেয়। এখন পাথরের টুকরো বা হুড়ি সেই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসে। শিশুরা এখন সুদৃশ্য কাঁকর ও পাথরের হুড়ি সংগ্রহ করতে মাতে। এগুলো নিয়ে খেলা করে। কাঁকর বা পাথর বালি ও মাটিরই সমগোত্রীয়, অথচ তাদের শুষ্কতা ও কাঠিন্যের দরুন তা দেহকে অপরিচ্ছন্ন করে না। কাজেই হুড়ি পাথর পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে এই পর্যায়ে বেশী গ্রহণীয়।

কিন্তু হুড়ি-পাথরও মলের পূর্ণ প্রতীক (complete symbol) নয়, খণ্ড প্রতীকমাত্র। মলের প্রতীক পরিণতির ইতিহাসে 'প্রস্তর' যুগের পর আসে 'কৃত্রিমতার' যুগ। কর্দম থেকে পাথর পর্যন্ত বস্তুগুলি সবই প্রাকৃতিক। মলও প্রাকৃতিক। কাজেই দুয়ের ঐক্য যেন তখনও চোখে পড়ে। এর আরও গোপনীয়তা দরকার। তাই ক্রমে কৃত্রিমবস্তু আসে মলের প্রতিকল্প হিসাবে। এখন পাথরের হুড়ি সঞ্চয়ের বদলে ছেলেমেয়েরা কাঁচের গুলি, রঙীন বোতাম, বিচিত্র রঙ ও ঢঙের ফলের গুটি ইত্যাদি সংগ্রহে মন দেয়। এই সংগ্রহের মধ্যেই তাদের মলসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি গোপনে তৃপ্ত হয়। বড়দের, বিভিন্ন দেশ ও কালের মুদ্রা, ডাক টিকিট ও বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তাক্ষর সংগ্রহের মধ্যেও এই শৈশবের মলসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিটিই অজ্ঞাতভাবে কাজ করে।

এবারে আবির্ভূত হয় 'স্বর্ণ যুগ'। এই শেষ পর্যায়ে মল-প্রীতি স্বর্ণ-প্রীতিতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ স্বর্ণ বা ধাতুমুদ্রা মলের পূর্ণ প্রতীকরূপে শেষ পর্যায়ে দেখা দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সঞ্চয়ের বস্তুটি (মলের প্রতিকল্প) আরও সামাজিক রূপ নেয়। সামাজিক শিক্ষায় ক্রমশঃ শিশু স্বর্ণের মূল্য জানতে শেখে, টাকা পয়সা চিনতে শেখে। এগুলোর মহার্ঘতাও ক্রমশঃ জানে। কাজেই তার সঞ্চয়ের বস্তু হিসাবে এই মহার্ঘ স্বর্ণ বা অন্যান্য আর্থিক মুদ্রাতেই আদিম মলসঞ্চয়-প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় : 'The original erotic interest in defaecation is, as we know,

destined to be extinguished in later years; it is in these years that the interest in money is making its appearance as something new which was unknown in childhood. This makes it easier for the earlier impulse, which is in process of relinquishing its aim, to be carried over to the new one'[২].

কাজেই ধাতুমুদ্রার প্রতি মনের আকর্ষণ প্রথমতঃ প্রাবৃত্তিক। পরে এই প্রাবৃত্তিক চাহিদার সঙ্গে ব্যবহারিক বিবেচনাও যুক্ত হয়। কাগজীমুদ্রার সঙ্গে মল-প্রীতি সোজাসুজিভাবে যুক্ত নয়। দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে, কিন্তু তা যেন দূর সম্পর্ক। কারণ, শৈশবে ধাতুমুদ্রাকেই মলের প্রতীক হিসাবে শিশু দেখেছে, কাগজীমুদ্রাকে নয়। ধাতুমুদ্রা মলের শোভন-সংস্করণ। কারণ, ধাতুমুদ্রার মলের মতই ভার আছে, অথচ মলের মতো নরম বা আর্দ্র নয়, শুষ্ক ও শক্ত। অপর দিকে তার দুর্গন্ধ নেই, অথচ চাকচিক্য আছে; কাজেই নোংরা মলের চেয়ে সামাজিক দিক্ থেকে তা বেশী গ্রহণীয়। কিন্তু কাগজীমুদ্রার মধ্যে মলের অহরূপ ভার বা ধাতুমুদ্রার মতো আকর্ষণীয় চাকচিক্য নেই। তাই কাগজীমুদ্রার (paper currency) দ্বারা শিশুর মল সম্পর্কিত প্রক্ষোভজ আকর্ষণ ও সামাজিক শিক্ষা একত্রে কার্যকরী হয় না। সেই কারণে শৈশবে কাগজীমুদ্রার সঙ্গে শিশুর প্রক্ষোভজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। বয়ঃবৃদ্ধির অনেক পরে সে কাগজীমুদ্রাকে 'মূল্যবান' ব'লে জানে। কিন্তু যখনই জানুক, তাও ক্রমে শৈশবের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়—যদিও সে যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে কামশক্তির ক্রমবিকাশের একটি পর্যায়ে পায়ুদেশ থেকে শিশু যৌন উত্তেজনা ভোগ ক'রে থাকে। মলের চাপে এবং ঘর্ষণে, সেই উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। কোনও কোনও শিশু এই উত্তেজনাকে দীর্ঘকাল ভোগ করবার জন্যে মলত্যাগ না ক'রে তা সঞ্চয় ক'রে রাখে। ফলে পায়ুদেশে উত্তেজনা সঞ্চিত থাকে। যাদের কামশক্তির একটা অংশ এই পর্যায়ে সংবদ্ধ (fixated) হয়ে পড়ে, তারা প্রাপ্তবয়সেও অজ্ঞাতভাবে এই পায়ুর উত্তেজনা ভোগ করতে চায় এবং বিভিন্ন গোপন উপায়ে তা ক'রেও থাকে। আগে মল সঞ্চয় ক'রে যে প্রবৃত্তি তৃপ্ত হ'ত, প্রাপ্তবয়সে সেই প্রবৃত্তিই অর্থ-সঞ্চয়ের রূপ নেয়। কৃপণের কার্পণ্য বা ব্যয়কুণ্ঠা, জেদী শিশুর মলত্যাগে তীব্র আপত্তিরই গোপন প্রকাশ। মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে মল যেমন অর্থের প্রতীক, কৃপণের অর্থ-সঞ্চয়ও তাই মলসঞ্চয়েরই রূপান্তর। স্যাণ্ডর ফেরেনৎসির ভাষায়: 'Pleasure in the intestinal contents becomes enjoyment of money, which, however,.....is seen to be nothing other than odourless, dehydrated filth that has been made to shine'.[৩]

শিশু মল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, খেলা করতে, মল জমিয়ে রেখে উত্তেজনা ভোগ করতে এবং মলত্যাগ না করতে যেমন ব্যগ্র, কৃপণও তেমনি অর্থ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেও খরচে বিমুখ হয়ে অর্থ জমিয়ে রেখে এই শৈশব প্রবৃত্তিকেই তৃপ্ত করতে ব্যগ্র। 'বোধোদয়ে' বর্ণিত 'কৃপণ ও ওপ্তধন' নামক গল্পটির মধ্যে এই মলপ্রীতিরই গোপন নির্দেশ আছে। সেখানে দেখা যায় এক কৃপণ সর্বস্ব ঘুচিয়ে একতাল স্বর্ণ সংগ্রহ ক'রে তা মাটির তলায় পুঁতে রাখে। সে প্রতিদিন সেই সোনার তালটি মাটি খুঁড়ে বের করত, দেখে

[২] Freud: Collected Papers, Vol. II, p. 50, 'Character and Anal Erotism.'

[৩] Sandor Ferenczi; The Ontogenesis of the Interest in Money'; Sex in Psycho-Analysis (Dover edition) p. 276.

নাড়াচাড়া করত এবং আবার রেখে দিত। এক দিন এক চোর তা দেখতে পায় এবং সুযোগ বুঝে তা চুরি ক'রে নিয়ে যায়। কৃপণ তখন চুল ছিঁড়ে, মাথা খুঁড়ে বিলাপ করতে থাকে।

সমস্ত বিষয়-আশয় বেচে একতাল সোনা সংগ্রহ করার অর্থ, অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে আসক্তিকে সরিয়ে নিয়ে মলের প্রতি ও পায়ুকামের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হওয়া। সোনার তালটি মাটি খুঁড়ে বের ক'রে দেখা এবং মাটিতে তা ভ'রে রাখার মধ্যে, মলকে খানিকটা পায়ু থেকে বের ক'রে আবার তা ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে ঘর্ষণজাত পায়ুজ উত্তেজনা ভোগ করার প্রবৃত্তিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কাজেই অর্থ, যে কোনও রূপেই (form) হ'ক, সঞ্চয়ের বাড়াবাড়ির মধ্যে তা মলের প্রতীক হিসাবেই কাজ করে। কাগজীমুদ্রা যেমন নোট, চেক ইত্যাদিও এইরূপ প্রতীক হতে পারে তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ধাতুমুদ্রার মতো কাগজীমুদ্রার মলের সঙ্গে সম্পর্কটি যেহেতু তত গভীর নয়, তাই কৃপণদের মধ্যে ধাতুমুদ্রা-সঞ্চয়ের প্রবণতাটিই বিশেষ প্রবল। এ ছাড়াও দেখা যায় যে অনেক কৃপণ ব্যক্তি, যাঁরা ধাতুমুদ্রায় অল্প খরচও করতে পারেন না তাঁরা নোটে বা চেকে মোটা খরচ করতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু মুদ্রায় অল্প খরচ করতে গেলেও তা যেন তাঁদের হাতে আটকে যায়। সাধারণ লোকেও একটি মোটা অঙ্কের চেক দিতে তত বিচলিত হন না, যতটা ঐ অঙ্কেরই মুদ্রা দিতে হন। এর কারণ, ধাতুমুদ্রার সঙ্গে মলের নৈকট্য ও কাগজীমুদ্রার দূরত্বের মধ্যেই বর্তমান।

আমাদের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে অর্থ যে মলের সমগোত্রীয়, তার নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, 'টাকা হাতের ময়লা'। প্রথমতঃ, টাকা ময়লার সামিল এবং এ ময়লা দেহের (হাতের)। এ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় মনের কাছে টাকার মূল্য কী। সে মূল্য হচ্ছে, টাকা ময়লার সামিল। কিন্তু এখানে যদিও টাকাকে দেহের ময়লার সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, তবুও পায়ুর ময়লা বা মল এ কথা খোলাখুলিভাবে বলা হয় নি। তার কারণ, পায়ুমলের প্রতি সামাজিক বিরূপতা। এ ব্যাপারে সমাজের নিষেধ প্রবল। তাই মন টাকা সম্পর্কে পায়ুর মলের সঙ্গে তার আত্মীয়তাকে আড়ালে রেখে ভাষা ব্যবহারে হাতের ময়লা কথাটিই গ্রহণ করেছে। কিন্তু মনের গোপন দৃষ্টিতে টাকা=হাতের ময়লা=পায়ুমল। সামাজিক নিষেধ যে ব্যাপারে প্রবল, মন সেটিকে চেপে রাখে (repression)। টাকা যে ময়লার সামিল, মন সেটুকু খোলাখুলি স্বীকার করেছে, কারণ সেখানে নিষেধ নেই। যেহেতু সেই ময়লার আদিমরূপ অর্থাৎ মল (faeces) সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু দেহের অপর ময়লা (হাতের) তা নয়, তাই অনিষিদ্ধ মলরূপেই টাকাকে মন সোজাসুজি দেখছে এবং ময়লার আদিম রূপটিকে আড়ালে ঠেলে দিয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অর্থ নির্জ্ঞান মনের কাছে মলের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

'কাঁচা টাকা' বা 'কাঁচা পয়সা' কথার মধ্যেও অর্থের এই আদিম রূপটির প্রতি নির্দেশ আছে বলেই মনে হয়। 'কাঁচা' শব্দের সঙ্গে আর্দ্র, সরস, টাটকা ইত্যাদি ব্যঞ্জনা জড়িত। কাজেই 'কাঁচা টাকা' কথা ব্যবহারের মধ্যেও টাকার সরস ও গলিত আদিম অবস্থার অর্থাৎ মলের প্রতিই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। মল যেমন সহজলভ্য ও সহজপরিহার্য বস্তু, 'কাঁচা টাকার' অর্থও তেমনি সহজলভ্য টাকা যা অনায়াসে যথেচ্ছ খরচ করা যায়। শিল্পাঞ্চলে বা ব্যবসাকেন্দ্রে যে সমস্ত ব্যক্তি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং সহজে প্রচুর ব্যয় করেন, তাঁদের প্রসঙ্গে বলা হয়: 'কাঁচা টাকা পাচ্ছে, কাজেই এস্তার খরচ করছে'। এ সব অঞ্চলকেও বলা হয় কাঁচা টাকার জায়গা।

'কৃপণের মুখ দেখলে অন্ন জুটবে না'—আমাদের এই যে বিশ্বাস বা সংস্কার এর পিছনেও মনে

হয় সর্বজনীন মলপ্রীতিই ক্রিয়াশীল। কৃপণ মল এবং মলপ্রতীক টাকা জমিয়ে রাখে। সে ব্যয়ে কুণ্ঠিত, তাই তার অন্ন জোটে না। সাধারণ মানুষ ভাবে, ঐ কৃপণের মুখ দেখলে বুঝি তাদেরও অন্ন জুটবে না! কিন্তু একটির সাথে অপরটির কোনও কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সকলের মনেই মলপ্রীতিবশতঃ মলসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু সামাজিক শিক্ষার চাপে সে প্রবৃত্তিকে অবদমিত ক'রে রাখা হয়। মন প্রলুব্ধ হবার ভয়ে সে প্রবৃত্তিকে সামনে থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু কৃপণের সাক্ষাতে তার ব্যয়কুণ্ঠা ও সঞ্চয়স্পৃহা যেন অপর মনেও সংক্রমিত হয়ে ঐ গোপন মলপ্রীতিকে নাড়া দেয় এবং মল সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ ক'রে তোলে। কিন্তু মলসঞ্চয় প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলে অর্থকার্পণ্য দেখা দেবে। তখন অন্যদেরও কৃপণের মতো অন্নাভাব হবে! এই গোপন বিবেচনা থেকেই যেন লোকে কৃপণকে পরিহার করতে বাধ্য হয়। নিজেদের মলপ্রীতিকে দূরে সরিয়ে রাখার দরুনই যেন তার উদ্দীপক (stimulus) কৃপণকে পরিহার করা।

কিন্তু অর্থের মলের ছদ্মবেশ ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ছদ্মবেশ গ্রহণ করেও কয়েকটি প্রবৃত্তির গোপন ভোগ তৃপ্ত করবার সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন অর্থ কখনও বীর্য (semen), কখনও সন্তান (child) বা লিঙ্গের (penis) প্রতীক হিসাবে কাজ করে। মনের উভকামীধর্মের দরুন স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি মনেই পুরুষ ও স্ত্রীবৃত্তি উভয়ই বর্তমান থাকে। কোনও পুরুষ-ব্যক্তিত্বে ভোগবৃত্তি (passivity) অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সমকাম (passive homosexuality) বা স্ত্রীকাম (femininity) সহজ স্বচ্ছন্দ না থাকলে সেই ব্যক্তি নিজের পুরুষত্বকে দুর্বল দেখে। বীর্য মনের কাছে পুরুষত্বের নিদর্শন। তাই ভোগবৃত্তির প্রাবল্যে পুরুষত্ব বা বীর্য গেল—সর্বদাই এই আতঙ্ক দেখা দেয়। এর দরুন ব্যক্তি বীর্যকে তো অস্বাভাবিক মূল্য দেয়ই, অধিকন্তু টাকাকেও বীর্যের প্রতীক হিসাবে বীর্য ধারণের মতোই সঞ্চয় ক'রে রাখবার প্রবল প্রবণতা দেখা দেয়। কৃপণ মলপ্রীতি বশতঃ যেমন অর্থ জমাতে উৎসুক হয়, পৌরুষ-বিগর্হিত ব্যক্তিরও তেমনি বীর্য-সঞ্চয় প্রবৃত্তি থেকে কার্পণ্য দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থ হয় বীর্যের প্রতীক।

গ্রামদেশে কথা-প্রসঙ্গে বলা হয় : 'টাকার ব্যাটা পাথর কাটা'। অর্থাৎ অর্থশালী ব্যক্তির পুত্রের প্রচণ্ড শক্তি, সে পাথর কাটতে পারে। কিন্তু পাথর কাটতে প্রয়োজন দৈহিক শক্তির। প্রচুর অর্থ দৈহিক শক্তি বাড়াবে কী ক'রে? কাজেই অর্থকে এক্ষেত্রে বস্তুমূল্য না দিয়ে কাল্পনিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে। অর্থকে শক্তিরূপে দেখা হচ্ছে এবং তাকে বস্তুজগতে না রেখে ব্যক্তির অন্তর্জগতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। তখন সে শক্তি বীর্যরূপে দেখা দিচ্ছে। ফলে প্রচুর অর্থ থাকার দরুন নিজেকে বীর্যবান ও শক্তিশালী ব'লে বিশ্বাস করা হচ্ছে। নির্জ্ঞান মনে অর্থ যে বীর্যের প্রতীক হিসাবে কাজ করে এই ভাষা ব্যবহারে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

অর্থ আবার সন্তানেরও রূপ নিতে পারে। সন্তান প্রসব স্ত্রীলোকের একটি স্বাভাবিক ধর্ম। মনের দিক্ থেকে এই সন্তান-প্রসবের সাথে অন্যান্য সব প্রসব বা প্রদান কার্য (delivery) জড়িত। স্ত্রীত্ব যেখানে সুস্থ ও সহজ সেখানে সন্তান প্রসবে আনন্দ। কিন্তু স্ত্রীত্ব যেখানে বাধাগ্রস্ত (inhibited) সেখানে প্রসব ব্যাপারে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। সে ব্যক্তি সন্তান-পেটের মধ্যেই ধ'রে রাখতে চায়। সন্তানকে ভিতর থেকে মুক্তি দিতে গেলে, 'খালি হয়ে গেলাম', এই ভেবে আতঙ্ক দেখা দেয়। স্ত্রীত্বের বিপত্তির দরুন সন্তান জন্ম দিয়ে নিজেকে খালাস করতে যে অসুবিধা তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেখানে দেওয়ার বা ত্যাগ করার কথা, সেখানেই দেখা দেয়। এরূপ ব্যক্তির কাছে অর্থ সন্তানরূপেই দেখা দেয় এবং রিক্ত

হওয়ার আতঙ্কে সন্তানকে নিজের মধ্যে বন্দী করে রাখার যে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা, অর্থের ব্যাপারেও সেই ধ'রে রাখার বাড়াবাড়ি দেখা দেয়। এরূপ ব্যক্তিরও কৃপণস্বভাব হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, দুই ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে। কারণ, স্ত্রীলোকের মধ্যে যে স্ত্রী বলেই স্ত্রীত্ব মুক্ত (free) থাকবে এমন কথা নয়। বিভিন্ন কারণে স্ত্রীলোকের মধ্যেও স্ত্রীত্ব বিপর্যস্ত হতে পারে। তখন এরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষেও প্রতীক হিসেবে (symbolically) অর্থকে সন্তান ভাবে গ্রহণ ক'রে সে বিষয়ে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে।

নির্জ্ঞান মনের কাছে অর্থ যে সন্তানের প্রতিকল্প তা বেশ স্পষ্ট হয় ছোট ছেলেকে আদর করবার সময় বড়দের কথা প্রয়োগ থেকে। বাচ্চাদের, 'ধন আমার, মাণিক আমার' ব'লে আদর করা হয়। এই কথা প্রয়োগের মধ্যেই সন্তানের সঙ্গে ধনমাণিক্যের বা অর্থের যে একটি ঐক্য মনের গোপন দৃষ্টিতে গোচরীভূত তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ ভাষা প্রয়োগের মধ্যে মানুষের আদিম দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু ছোঁয়াচ থেকে গেছে। আনেষ্ট জোন্সের ভাষায় : "It is becoming more and more realized by psycho-analysts that symbolism gradually formed through 'repression' during the progress of civilization leave traces of their original meaning as word-deposits".*

এ ছাড়াও অর্থ যে বীর্য ও সন্তানের প্রতীকরূপে ছদ্মবেশে মনের বিভিন্ন যৌনভোগ কীভাবে পূরণ করতে সহায়তা করে তার বিশেষ কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় রেস খেলোয়াড়, জুয়াড়ী, শেয়ার ব্যবসায়ী প্রভৃতি যারা অস্বভাবী ঝুঁকিযুক্ত ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ করে তাদের মধ্যে। রেস, জুয়া প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর অর্থ আসতে পারে একথা ঠিক। কিন্তু বিপরীত দিক্‌টাও সমান সত্য। এসব ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ধ্বংস হওয়া এবং সর্বনাশ হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সমাজও এইসব ব্যাপারকে প্রীতির চক্ষে দেখে না। কাজেই সাধারণ ব্যক্তি যাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তারা ব্যবসা, বাণিজ্য বা লাভজনক পেশা অবলম্বন করে। অধিকাংশ লোকই এই অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায় না। আর সমাজে তো দেখা যায় সহজ সাধারণ ব্যবসা করেই লোকে বেশী বিত্তশালী হয়েছে। জুয়া বা রেস খেলে বিত্তশালী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল ; তবু এক শ্রেণীর লোক সমাজের বিরূপতা ও সর্বনাশের সম্ভাবনার ঝুঁকি মাথায় নিয়েও এই অনিশ্চিত পথেই অর্থোপার্জনের দুর্জয় আকর্ষণ বোধ করে। কাজেই অস্বাভাবিক পথে অর্থোপার্জনের এই যে দুর্বার আকর্ষণ, একে অর্থের আকর্ষণ বলা যায় না। বরং এই পথটি ও পথের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে অন্যকিছু আকর্ষণীয়ের প্রবল প্রলোভনই লক্ষ্য বলা যেতে পারে। অর্থ লক্ষ্য হলে তো সহজ স্বাভাবিক আর দশজনের পথ খোলা ছিল? এ সব ব্যক্তি কিন্তু কিছুতেই সহজ পথে যাবে না। প্রচুর অর্থ ধ্বংসের পরও কিছু অর্থ হাতে পেলে আবার ঐ পথেই অর্থোপার্জনে ছুটবে। জুয়া, রেস ইত্যাদির মধ্যে যেন নেশা আছে। খেললে আর ছাড়া যায় না। সর্বস্ব না যাওয়া পর্যন্ত খেলার আকর্ষণ বেড়ে যায়; আবার প্রচুর অর্থ পেলেও আশা মেটে না—খেলার আকর্ষণ তখনও বাড়ে। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ে লোকের এরকম নেশাগ্রস্ত ভাবটি হয় না। লাভ বা লোকসান হলে ব্যবসায়ী খতিয়ে দেখে, পুনরায় টাকা নিয়োগ করবে কিনা। সেখানে যুক্তিবিচারের অবকাশ আছে, কিন্তু জুয়ায় তা নেই। কাজেই বোঝা যায় যে জুয়ার আকর্ষণ কেবল অর্থের আকর্ষণ নয়। এর সঙ্গে অন্যান্য প্রলোভনও যুক্ত আছে এবং সেই প্রলোভনগুলিই ব্যক্তিকে দুর্বারভাবে চালিত করে, যুক্তিতর্ক খাটে না।

* E Jones : Essays in Applied Psycho-Analysis, vol. II. p. 98.

জুয়াড়ী, শেয়ার ব্যবসায়ী প্রভৃতির অর্থোপার্জন কাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে কাজের দুটো দিক্ আছে—অর্থ পাওয়ার দিক্ ও অর্থ দেওয়ার দিক্। জুয়াড়ী জুয়ায় বা শেয়ারে অর্থ নিয়োগ করার সময় এই দুটো দিক্‌কেই মেনে নেয়। অর্থাৎ সে অর্থ পেতেও যেমন উৎসুক, অর্থ নাশ করতেও তেমনি রাজী। প্রশ্ন উঠতে পারে: প্রতি ব্যবসাতেই তো লাভ লোকসান আছে, শুধু জুয়ায় কেন? লাভ লোকসান সব ব্যবসাতেই আছে এবং ব্যবসা করতে নামলে উভয় দিক্‌কেই মেনে নিয়ে ব্যবসায় নামতে হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ে জুয়ার মতো পাওয়া না-পাওয়ার তীব্র দ্বন্দ্ব সত্যিই আছে কি? জুয়ায় বা ঐ জাতীয় ব্যবসায় অর্থ নিয়োগ করামাত্র যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সাধারণ ব্যবসায়ে তা হয় কি? সাধারণ ব্যবসা কখনও উত্তেজনার পথে চলে না। সেখানে ধীরস্থির যুক্তিতর্ক ও হিসাব-নিকাশের অবকাশই বেশী। সে চলে সমতল পথে। কখনও অবশ্য সমতল পথেও দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু তা সর্বদাই আকস্মিক ও ব্যতিক্রম। কিন্তু জুয়া বা ঐ জাতীয় ব্যবসার পথ সদাই চড়াই উৎরাই-এর পথ। সেখানে সদাই দোদুল্যমান চিত্তচাঞ্চল্যকর অবস্থা। ব্যবসায়ী সেখানে সদাই উৎকণ্ঠিত এই বুঝি গেল, এই বুঝি এল! কাজেই এই অতি অনিশ্চিত পথে অর্থোপার্জনে যাদের আগ্রহ তাদের যে এই পাওয়া-না-পাওয়ার আশা-আশঙ্কার অনিশ্চয়তার চিত্তদোলানিটুকু ভোগ করবার উদগ্র ইচ্ছা থাকে তা বলতেই হবে। সাধারণ মনের কাছে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা পীড়াদায়ক। কিন্তু অনেক নির্জ্ঞান মনের কাছে উত্তেজনার একটি উপভোগ্য রূপও থাকে। তাই বলা যেতে পারে—জুয়াড়ী ইত্যাদির নির্জ্ঞান মনে পাওয়া ও দেওয়ার একটি গোপন চাহিদা থাকে, সজ্ঞানে সেটি জুয়া খেলার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। আসলে পাওয়া-না-পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে যে তীব্র উত্তেজনা সেই উত্তেজনাটুকুই জুয়াড়ীর নির্জ্ঞান মনের দাবি এবং জুয়া খেলে বা শেয়ার ব্যবসা ক'রে সেই গোপন ইচ্ছাই তাদের তৃপ্ত হয়ে থাকে। এরই জন্যে নিরাপদ পথে অর্থোপার্জন তারা পছন্দ করে না। এরূপ ব্যবসা তাদের কাছে নিতান্তই জোলো বা পানসে ব্যাপার, আর জুয়ার মধ্যে আছে নেশা, মোহ বা রোমান্স-এর মদির আস্বাদন।

জুয়ার পাওয়া না-পাওয়ার পিছনে যে গভীর অর্থ থাকে তৃতীয় মনোবিজ্ঞার দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর অর্থ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মৌন চাহিদা। অর্থ পাওয়া বা লাভ করাকে মন দুরকম ভাবে দেখতে পারে—স্ত্রীরূপে পাওয়া অর্থে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা, আর পুরুষরূপে পাওয়া অর্থে সক্রিয়ভাবে আদায় ক'রে নেওয়া। স্ত্রীরূপে অর্থ গ্রহণ করার দ্বারা স্ত্রীমনের (পুরুষ বা স্ত্রী-লোক উভয়েরই) সন্তান লাভের ইচ্ছা তৃপ্ত হয়। আর পুরুষরূপে অর্থ আদায় করা, পুরুষ-মনের বীর্য দিয়ে সন্তান উৎপাদন করার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করে। আগেই বলা হয়েছে যে, অর্থ বীর্য বা সন্তান লাভ উভয়েরই প্রতীক হতে পারে।

জুয়াখেলার অপরদিক্‌টা, অর্থাৎ অর্থ না-পাওয়া বা দেওয়ার দিক্ বিশ্লেষণ করলেও এমনই দুটি প্রবৃত্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। জুয়ায় অর্থ দেওয়া পুরুষ-সুলভ ইচ্ছা হতে পারে। সেখানে অর্থ দেওয়ার মাধ্যমে বীর্য দিয়ে পুরুষ-সুলভ সম্ভোগের কথা আসে। আবার অর্থ দেওয়াকে যেখানে ঠকা হিসেবে দেখা হয়, সেখানে স্ত্রীবৃত্তি (femininity) বা নিষ্ক্রিয় সমকামিতার (passive homosexuality) ইচ্ছাপূরণ বলা যেতে পারে।

অর্থ যেমন বীর্য বা সন্তানের প্রতীক, তেমনই লিঙ্গেরও প্রতীক হতে পারে। ভাষা প্রয়োগেই এ সত্যের ইঙ্গিত আছে। আর্থ সম্পদকে বলা হয় 'ধন' (wealth), আবার পুরুষ লিঙ্গকে বলা হয়

'ধন'। দুই বস্তু যখন একই নামে অভিহিত এবং উভয়েই যখন 'মূল্যবান' তখন উভয়ের মধ্যে একটি ঐক্য থাকা স্বাভাবিক। তার আরও প্রমাণ আছে। স্বর্ণ মূল্যবান বস্তু। লিঙ্গও পৌরুষের দিক্ থেকে মূল্যবান। এই লিঙ্গকে কোনও কোনও অঞ্চলে* 'সোনা' বলা হয়। কাজেই 'ধন' এবং 'সোনা' উভয়েই যখন লিঙ্গের অর্থবোধক তখন ধনসম্পদ বা অর্থ যে লিঙ্গের প্রতীক হবে তা খুবই স্বাভাবিক। তাই নির্জ্ঞান মনে অর্থের স্বরূপ সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলেছেন: 'On this level, faeces-money-gift-child-penis are taken as having the same meaning, and can be represented by the same symbols'।[৫]

অর্থব্যয়ে কুণ্ঠা বা কার্পণ্য যেমন মলপ্রীতির ছদ্মপ্রকাশ, অকুণ্ঠ অর্থব্যয় বা অর্থদান ব্যাপারেও তেমনি মানসিক কারণ বর্তমান থাকে। কারণ ঐ একই, অর্থাৎ মলপ্রীতি। তবে এই 'প্রীতি' এখানে আকর্ষণ হিসাবে দেখা না দিয়ে বিকর্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। ডক্টর বসু বলেছেন:—"While niggardliness is traceable to this factor, extravagance is accounted as a defensive reaction, just as exaggerated sympathy is a defence against an unconscious murderous tendency"।[৬] বাড়াবাড়ি রকম সহানুভূতি বা দয়া যেমন নির্জ্ঞানের জিঘাংসার বিপরীত প্রকাশ, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি রকমের দান-ধ্যানও মনের আদিম মলপ্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষণ-মূলক ব্যবস্থা (defence reaction)। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মন অসামাজিক-গোপন-ইচ্ছার বিপরীত অবস্থাকে বাড়াবাড়ি রকম (exaggerated) প্রাধান্য দেয়; কাজেই যে প্রবল মলপ্রীতি-বশতঃ অর্থসঞ্চয়ে আগ্রহশীল, সে প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থার বশে বাড়াবাড়ি রকম অর্থ ব্যয় করবে বা বিলিয়ে দেবে। সেখানেও অর্থ মলেরই প্রতীক। তেমনি যে ব্যক্তি ক্ষীণ পৌরুষবশতঃ বীর্য সঞ্চয়ে আগ্রহশীল, প্রতিরক্ষণ ক্রিয়ার বশে সে বাড়াবাড়ি রকম নিজের পৌরুষ জাহির করতে উদ্যোগী হবে, নানাভাবে অজস্র অর্থ ব্যয় করবে এবং দানধ্যান করবে। এখানে অর্থ বীর্যের প্রতীক। যে বীর্যের তার অভাব, সেই অভাবকে ঢেকে তার প্রাচুর্য জাহির করার জন্যেই এই নবাবীয়ানা ও দানছত্র।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে দানশীলতা কি আত্মপ্রচার প্রচেষ্টা? এর উত্তর—দানশীলতা স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিতে পারে আবার প্রতিরক্ষণ ক্রিয়া (defence reaction) হিসাবেও দেখা দিতে পারে। যেখানে তা স্বাভাবিক, অর্থাৎ দাতা গ্রহীতার দুঃখ ও প্রয়োজন বুঝে দান করেন, সেখানে আত্মপ্রচার অবশ্য নেই। সেখানে বাস্তববুদ্ধিই প্রধান্য লাভ করে, এবং অর্থ সেখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বস্তুমূল্যেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেকে নাম এবং যশঃ প্রার্থী হয়েও তো দানধ্যান করেন? সে ক্ষেত্রে 'অর্থ' অবশ্যই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে 'মল' বা 'বীর্যের' প্রতীক হতে পারে। কাজেই দানশীলতার ব্যাপারে অর্থের কোনও সাধারণ বা সার্বিক মূল্য স্থির করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দানের ক্ষেত্রে 'অর্থ' কোন্ বিশেষ মূল্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নির্ভর করবে বিভিন্ন দাতার প্রতিন্যাসের উপর।

---

* বর্দ্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে লিঙ্গকে 'সোনা' বলতে আমি শুনেছি। ধন এবং সোনা এই উভয় নামেই এখানে লিঙ্গ পরিচিত।

৫। Freud: New Introductory Lectures, p. 131.

৬। Dr. Girindrasekhar Bose: Everyday Psycho-Analysis, p. 22.

দানশীলতার ক্ষেত্রে অর্থ যেমন প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর অপরিমিত ধন-আহরণের মধ্যেও অর্থ প্রতীক রূপে কাজ করতে পারে। ডক্টর বসু বলেছেন—'Then there is the multimillionaire type who is ever restless and goes on expanding his business to proportions aimed at by Ford or a Rockfeller. This is traceable to a modification of the Oedipus Complex'।[১] এই যে অবিশ্রাম ধন আহরণের প্রচেষ্টা, একেও অর্থের স্বাভাবিক মূল্যায়ন বলা চলে না। অর্থের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আসলে পৌরুষ বা বীর্য আহরণের প্রয়াস। এরূপ মনে ইডিপস্ ইচ্ছার (Oedipus wish) প্রাধান্যের দরুন ব্যক্তি নিজেকে পিতার সমতুল্য শক্তিশালী ক'রে মাতাকে ভোগ করতে চায়। অর্থগ্রাসের এই উদগ্র ইচ্ছা আসলে দুর্বল শিশুর পিতার সমান শক্তিশালী হওয়ারই গোপন প্রচেষ্টা। তাই এ ক্ষেত্রে অর্থ বীর্য বা পৌরুষের প্রতীক।

এতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে অর্থবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণে অর্থের পরিচয় এক নয়। এর কারণ, অর্থবিদ্যা সংজ্ঞান মনের সঙ্গে সম্পর্কিত আর মনঃসমীক্ষণ নির্জ্ঞান মনের ব্যাপার। নির্জ্ঞান মনে প্রতীকের ব্যবহার প্রচলিত। সেই প্রতীকের অর্থ-বিশ্লেষণই মনঃসমীক্ষণের কাজ। এই প্রতীক সৃষ্ট হয়েছে সভ্যতার আবির্ভাব ও অগ্রগতিতে। মানুষ যতই আদিমতাকে দমন ক'রে সভ্য হয়েছে, আদিম প্রবৃত্তিগুলি ততই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছে। মনের এই আদিমতা মানুষের নির্জ্ঞানে আজও টিকে আছে। তাই নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান মনে 'অর্থের' অর্থ এক নয়। নির্জ্ঞানের 'অর্থ' প্রতীক—প্রতীকের উদ্দিষ্ট বস্তু থাকে ; সেই বস্তুগুলিই নির্জ্ঞান মনে 'অর্থের' অর্থ।

১। Dr. Girindrasekhar Bose : Everyday Psycho-Analysis. p, 26,

সমাজ মনোবিদ্যা ও বর্তমান পল্লীউন্নয়ন সমস্যা

শ্রীমতী মধুশ্রী বসু, এম. এ.

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুকে খাপছাড়া ব'লে মনে হবে। অনেকে হয়তো ভাববেন একজন মানুষের মনেরই সন্ধান পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে সমাজ মনোবিদ্যা কথাটি নিশ্চয়ই মনোবিদ্‌দের প্রগল্‌ভতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও সমাজ মনোবিদ্যা কঠিন কিছুই নয়। এটা কোনও এক বিরাট সমষ্টির বিজ্ঞান নয়। মানুষের সমাজে বাস করার যে-ইচ্ছা তার মূল কোথায় ও তা কীভাবে মানুষকে সামাজিক জীব ক'রে তুলছে তার অনুসন্ধানই হ'ল সমাজের মনোবিদ্যা।

সমাজের গোড়ার কথাই হ'ল সমষ্টি। মানুষ একলা থাকতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মানুষ কেন, জীবজগতের নিয়মই হচ্ছে সমষ্টিতে বাস করা। এ বিষয়ে মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, এই যে সবার একসঙ্গে থাকার প্রবল ইচ্ছা এর পিছনে আছে যূথচারিতা (gregarious instinct) নামে একটি সহজপ্রবৃত্তি। এই সাহাজিক ইচ্ছার ফলে দেখা যায় অনেক জন্তুজানোয়ারও যূথ ছাড়া বাস করতে পারে না। জন্তুদের এই যূথে থাকবার কারণ দুটি : নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, এবং জীবনধারণ করা।

মানুষের মধ্যেও এই ইচ্ছা প্রবল। কিন্তু মানুষ শুধু তারই জন্য সমাজে বাস করছে মনে করলে ভুল হবে।

সমাজ সৃষ্টি হয়েছে অবশ্য এই যূথচারী প্রবৃত্তির বশেই, কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার পর ক্রমশঃ মানুষ এই মূল চাহিদার গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে এসেছে। শেষপর্যন্ত আজকের দিনে মানুষের মনের চাহিদাও সাধারণ খাওয়াপরা ও নিরাপত্তার চাহিদার প্রায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই এত পড়াশোনা, ললিতকলাচর্চা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আয়োজন।

এখন অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, সমাজে থাকবার জন্য মানুষের যখন এত বড় চাহিদা তবে কেন দিনরাত এত মারামারি, এত রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিচ্ছে।

সব কিছুরই যেমন নিয়ম আছে তেমনই সমাজও সমাজের নিয়ম মেনে চলে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ নানারকম সমষ্টি নিয়ে তৈরি হয়েছে। মানুষের পরিবারকে সমাজের আদিম পর্ব বলা যেতে পারে। সমাজের বিভিন্ন সমষ্টির নানারকম কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে তাদের পরস্পরের শক্তি প্রকাশ পায় ও এই ধরনের শক্তি বিনিময়ের ফলে সমাজের পরিবর্তন হতে থাকে।

একটা বিশেষভাবে সাজানো সমাজ, তা যত ভালই হ'ক না কেন, চিরকালের জন্য কখনই স্থায়ী হতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রেই আছে পৃথিবীর এবং মানুষের সব রকমের সাম্য রক্ষার জন্য যুগে যুগে ত্রাতা আবির্ভূত হন।

এই কথাটির যে বেশ একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে তা আমাদের সমাজব্যবস্থার চলমান চক্র একটু ভাল ভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

সমাজব্যবস্থা খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা প্রগতিশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হলেই তা আর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে খাপ খায় না। তখন একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন ঘটে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী। কোনও কোনও জায়গায় এই পরিবর্তন প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কখন কি ভাবে ঘটে যায় তা কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ একদিন দেখা যায় সমাজের ব্যবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে।

আবার অনেক জায়গায় একদল লোক হয়তো প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সমাজব্যবস্থার প্রাচীন ভিত্তি আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু প্রগতির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ভিত্তি এক সময় শিথিল হয়ে পড়ে, তখন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই পরিবর্তনের একটি ছক দেওয়া যেতে পারে :—

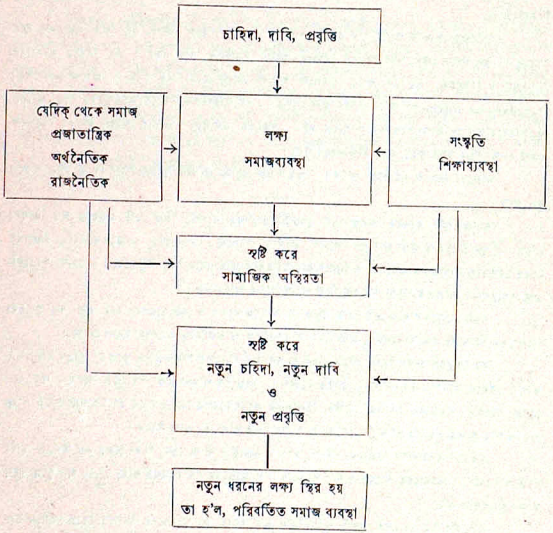

এই যে বিশেষ নিয়ম অলক্ষ্যে সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তার প্রভাব সর্বত্র।

আমাদের দেশের পল্লীসমাজ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে গেলেও দেখা যাবে এই নিয়ম সেখানেও কাজ করছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজব্যবস্থার গোড়ার কথা যখন এই নিয়ম, তখন সমাজের কোনও রকম উন্নতিসাধন করতে গেলেও এই নিয়মের সাহায্য নিতে হবে।

এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে নিয়মটাই তো পরিবর্তনের এবং সেই পরিবর্তন প্রগতির, তবে কেন আবার আলাদা ক'রে উন্নতিসাধনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে অনেক সমাজব্যবস্থা তার বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু কোথায় এই অস্থিরতার সমাধান তা নিজেরা উপলব্ধি ক'রে উঠতে পারে না। আবদ্ধ থাকতে থাকতে এই উপলব্ধির বোধটিই তাদের নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের ভারতবর্ষের পল্লী-সমাজের অবস্থা ঠিক এই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্বে এই পল্লীগুলিই ছিল সব রকম অনুষ্ঠানের, কাজকর্মের ক্ষেত্র। তখনকার দিনের মানুষ উপলব্ধি করেছিল "শান্তিপুর্ণ" সহ অবস্থানই হ'ল সভ্যতার গোড়ার কথা; তাই তারা মিলেমিশে থাকত।

তারপর ধীরে ধীরে বাইরে থেকে বহু সমস্যা ও জটীলতা দেখা দিতে লাগল। এরজন্য বাইরের কতকগুলো শক্তি দায়ী তো ছিলই, উপরন্তু গ্রামবাসীদের সভ্যতার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলার অসমতাও অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল।

এখনকার মতো তখনও চাষবাসই গ্রামের লোকদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। এই উপজীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের লোকের উপর বিভিন্ন কাজের ভার থাকত। এই সম্পূর্ণ যুক্তিপুর্ণ কর্মগত ভেদ থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল জাতিগত বিভেদ। পরস্পরকে সাহায্য করার মনোভাব আস্তে আস্তে দলাদলিতে রূপান্তরিত হ'ল।

পল্লীসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এই রকম তখন বাইরেও বড় পরিবর্তন দেখা দিল। ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকের হাতে চ'লে গেল।

আভ্যন্তরীণ দলাদলির সুযোগে যে যেখান থেকে পারল শোষণ আরম্ভ ক'রে পল্লীগুলির অর্থনীতিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল।

পল্লীসমাজের স্বাভাবিক গতি বিভিন্ন শক্তির আবর্তে প'ড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। যখন অনেকেই নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করলেন তখন দেশময় স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দিল।

শেষপর্যন্ত বিদেশী শাসক দেশ ছেড়ে চ'লে গেল। কিন্তু যে সভ্যতা পিছনে প'ড়ে রইল তা সমানভাবে বিতরণ করা হ'ল না। তার ফলে সমাজের ভারসাম্য ক'মে গেল এবং সমাজের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থার সাহায্যে আস্তে আস্তে নতুন ক'রে দেশ গ'ড়ে উঠতে লাগল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি অন্যতম বিষয় হয়ে দেখা দিল "পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনা" (Community Development Project) : পল্লীসমাজের মধ্যেও সাড়া প'ড়ে গেল। দেশের কর্তাব্যক্তিরা আশা করতে লাগলেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় এই পরিকল্পনার আদর্শ সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করবে।

এই বিরাট পরিবর্তনের যুগে এই পরিকল্পনাটির সাফল্য বা অক্ষমতা সমস্ত নির্ভর করছে একটি বিশেষ কাজের উপর। সেই কাজটি হ'ল সমস্ত পল্লীগ্রামের লোককে এই আদর্শ অন্তর থেকে উপলব্ধি করার প্রেরণা দেওয়া এবং এই আদর্শ অনুযায়ী গ্রামের লোকের ঘরে সমস্ত পল্লীর কল্যাণের জন্য মিলে-মিশে কাজ করার প্রেরণা জাগানো।

এইখানেই শুরু হ'ল সমাজ মনোবিদ্যার কাজ। কারণ উপলব্ধির ভিতর দিয়ে যে পরিবর্তন আসে তা হ'ল সত্যিকার পরিবর্তন। "কোনও সমাজব্যবস্থাকেই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তা গাছের মতই নীচের মূলের উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে ওঠে।"

এই যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তা বাহ্যিক অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। সামগ্রিক-ভাবে জীবনধারণের মানই এর ফলে পরিবর্তিত হবে আশা করা যায়। পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও কাজের ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হবে মনে করা যায়।

সেইজন্য গ্রামে পুরানো দলাদলি শেষ ক'রে দিয়ে অনেক নতুন দল, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি গঠন ক'রে এই পরিকল্পনার আদর্শ বহুলভাবে প্রচারিত করা হচ্ছে। পরিকল্পিত উন্নতি কি ধরনের হবে তা এই সব সংঘের সাহায্যে উদাহরণস্বরূপ স্থাপন করা হচ্ছে।

সবরকম দলগঠনের মধ্যেই সংঘগতিয় (group dynamics) ব'লে সমাজ মনোবিদ্যার একটা বিশেষ ধারা কাজ করে। এই গতিয় অনুসারে গণ বা সংঘের মানস অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে দলগঠনের প্রধান উপাদান হচ্ছে একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যটি হচ্ছে সামগ্রিকভাবে-জীবনযাপনের মান উন্নীত করা।

এই উদ্দেশ্য ঠিকভাবে উপলব্ধি ক'রে যাঁরা সমগ্রভাবে দলটিকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাঁদেরই দলের অধিনায়ক বা পরিচালকের পদ দেওয়া হয়।

আগেকার দিনের গ্রাম্য দলাদলি ও প্রতাপ বিস্তারের সময় আস্তে আস্তে চ'লে যাবে আশা করা যায়। এখন কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গ্রামের লোকের মনে অধিনায়কের উপর নির্ভর করার শক্তি জাগাতে হবে।

যে সমস্ত গ্রামের লোকেরা তাঁদের সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁরা এখন কাজের মধ্যে দিয়ে পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসুক।

এই পরিকল্পনায় সঙ্গতভাবে অংশ গ্রহণ করতে হলে সুসংবদ্ধ দল, স্থির উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষম পরিচালকের দরকার।

সেইজন্য এখন এই পরিকল্পনার ফলে সংঘগতিয় ও নেতৃত্বের ধরন কি ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখা খুবই প্রয়োজন। দলের সভ্যদের আদর্শ নেতা ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে কি ধারণা, কি ধরনের নেতৃত্ব ও সংঘবদ্ধ কাজের ফলে এই পরিকল্পনাটি সুসমঞ্জসভাবে সফল হবে তা সমাজ মনোবিদ্যার ধারা অনুসারে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলেই সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত হবে আশা করা যায়।

সমাজ মনোবিদ্যার বিশেষ ধারা সম্বন্ধে অনুশীলন করতে হলে বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এবং বিশ্লেষণের বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই একটি পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্র প্রধাণতঃ তিনটি :—(১) একজন মানুষের সামাজিক ব্যবহার, (২) একটি

দলের দলগতভাবে সামাজিক ব্যবহার, এবং (৩) একটি সংঘের, কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ। এই তিনটি ক্ষেত্র বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে তার মধ্যে আমরা সমস্ত সামাজিক সমস্যেরই কারণ খুঁজে পাব।

এই বিশ্লেষণের ফলে পল্লীউন্নয়নের সম্বন্ধে পল্লীবাসীদের যে মনোভাব পরিলক্ষিত হবে তারই উপর এই পরিকল্পনাটির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

এই পরিকল্পনাটির সাফল্যে সমাজ মনোবিদ্যার খুব বড় একটি অংশ রয়েছে মনে করলে খুব ভুল হবে না।

———

অন্তর্দৃষ্টি

শ্রীমতী মীরা দেবী এম. এ., ডি. এম্. পি.

অজানাকে জানবার, নতুনের সাথে পরিচিত হবার এক প্রকৃষ্ট পথ হ'ল দৃষ্টির পথ। কোনও বিবৃতির সত্যাসত্য প্রমাণ করতে হলে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নজির দেখাই। আমাদের শাস্ত্র দৃষ্টিজাত জ্ঞানকে জ্ঞানার্জনের অন্যতম পথ ব'লে মেনে নিয়েছে বলেই সে শাস্ত্রের নামকরণ হ'ল দর্শনশাস্ত্র। জ্ঞানের সঙ্গে দৃষ্টির এই নিবিড় সম্পর্কের জন্যই বোধ হয় অনেক ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানকেও দৃষ্টিজাতরূপে দেখে অনুরূপ অবিহিত করা হয়, যেমন দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি। দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টিজাত জ্ঞানের বাহক চক্ষু নয়, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও তীক্ষ্ণ-ধী। চক্ষু যেমন উপস্থিত দৃশ্যবস্তুর সাথে পরিচয় করায়, তার গুণাগুণ জানায়, তেমনি দূরদৃষ্টি তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ ক'রে বর্তমানের পরিণতির ছবি দেখায়। আর অন্তর্দৃষ্টি কোনও পরিস্থিতির দুর্বোধ প্রহেলিকা, নানা ছদ্মবেশ, নানা আবরণ ভেদ ক'রে জ্ঞাতব্য বিষয়কে যথাযথরূপে দেখতে সাহায্য করে।

উভয়ক্ষেত্রেই যে জ্ঞান আমরা পাচ্ছি, পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূত উপলব্ধির থেকে তা বহুল পরিমাণে স্থূল দেহের অতীত। সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও তীক্ষ্ণ-ধী এদের উৎকর্ষের মূল উৎস হলেও এদের অবস্থিতি কেবল এই দুই শক্তিতেই নিহিত নয়। উভয়ই বিশেষ চারিত্রিক গুণ—যা বিভিন্ন পরিমাণে বা মাত্রায় সকলেরই থাকে। কেউ কেউ আবার এদের থেকে আজীবন বঞ্চিতই থেকে যায়।

অন্তর্দৃষ্টির কেবল আকারভেদই নয়, প্রকারভেদও থাকতে পারে। অনেকে হয়তো বলবেন এ শক্তি একক এবং অভিন্ন; কেউ এ শক্তির অধিকারী হলে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তা কার্যকর হবে। আবার অনেকে হয়তো বলবেন জীবনের এক ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি কার্যকর হলেই যে অপর ক্ষেত্রে হতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। মানবমনের নানা বিকার সম্পর্কে দক্ষ চিকিৎসকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকে। অসুস্থ মনের প্রকাশ যত আচ্ছাদিত ভাবেই হ'ক না কেন, যত বক্রপথ ধরুক না কেন, দক্ষ চিকিৎসকের কাছে তার যথাযথ রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। এ যথাযথ জ্ঞান কেবল মানসিক চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তকলব্ধ বা কার্য ক্ষেত্রের নানা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়; এ জ্ঞানের অন্যতম প্রধান পরিপোষক চিকিৎসকের অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টিই কি তাঁকে তাঁর নিজের মনের প্রতিটি ভাবধারা, তাঁর চারিত্রিক সব দোষগুণ, তাঁর সকল কার্যের কারণিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁকে পূর্ণ জ্ঞান দেবে? নিজের মনের নিজের ভাবধারা সম্পর্কে, নিজের গুণাগুণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করে যে দৃষ্টি সে দৃষ্টির অধিকারী না হলে বিচক্ষণ দ্রষ্টাও নিজের সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না। তাই বলছি যে অন্তর্দৃষ্টির প্রকার ভেদ আছে। এই শক্তির বিভিন্ন অংশের প্রকাশই প্রকার ভেদরূপে প্রতীত হয়। এই অংশগুলো মনের ও দেহের বিভিন্ন অংশের মতই কার্যত পরস্পরের থেকে বহুল পরিমাণে স্বাধীন, তবু ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই বিভিন্ন অংশ নিয়েই, প্রথমেই বলেছি, অন্তর্দৃষ্টির পরিমাণ ভেদ আছে। পরিপূর্ণভাবে অন্তর্দৃষ্টি দুর্জ্ঞেয়। তাকে পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন। আমরা যাদের সহজ স্বাভাবিক মানুষ ব'লে জানি তাদের মাঝে অল্পবিস্তর এ শক্তি থেকেই যায়।

আংশিকভাবে তারা নিজেকে বুঝতে পারেন। নিজেদের দোষ গুণ উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু সকলেই পারেন বললে ভুল হবে। এমন অনেকে আছেন নিজেদের সম্পর্কে যাঁরা অন্ধ। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক বলেই প্রতীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বাভাবিক অন্ধ। অপরের সহিত, পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কে তাঁদের নানা গোলযোগ থাকে, নানা সংঘাত বাধে। আরও এক দল আছে যাদের এ শক্তির আজন্ম অভাব নেই, কিন্তু সে শক্তি লোপ পায়—তারাই মানসিক রোগী। অনেক মনের রোগের নিদর্শন হ'ল নিজের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। মানসিক হাসপাতালে গেলে শুনেছেন হয়তো রোগী কেমন নির্বিকারে বলছে 'মশাই আমার কিচ্ছু হয়নি—দিব্বি ভাল ছিলাম। মিছিমিছি হাসপাতালে দিয়ে গেল।' তাদের ব্যবহারে যে পরিবর্তন হয়েছে মনের যে বিকৃতি ঘটেছে সে সম্বন্ধে তারা অপরকে জানাতে নারাজ এমন নয়। সে বিকৃতি সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই সচেতন নয়। অবশ্য অনেক রোগীর এ উপলব্ধি পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে। যাদের রোগের প্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি ব্যহত হয় তাদের রোগোপসমের অন্যতম নিদর্শন হ'ল অন্তর্দৃষ্টির পুনরুত্থান।

অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশের পথে অন্তরায় একাধিক। এক অন্তরায় হ'ল আত্মপ্রীতি। প্রীতি বা বিরুদ্ধভাব যত প্রবল হয় সত্য দর্শনে বিকৃতির সম্ভাবনা ততই অধিক। প্রীতির প্রভাবে দোষ ঢেকে গুণ বৃদ্ধি হয়। আর বিতরাগের প্রভাবে গুণ আড়াল হয়ে দোষ চতুর্গুণ রূপ ধরে। এইতো আমাদের স্বভাবের নিয়ম। আত্মপ্রীতি তাই স্বভাবত আমাদের সকল দোষকে চোখের আড়াল করে—গুণাবলীকে বড় ক'রে দেখায়, নানান্ যুক্তি দিয়ে অবাঞ্ছিত রূপকে ঢেকে শোভন রূপকে প্রকাশিত করে। অবশ্য প্রীতি যে সব সময়ই অন্ধ বা একদেশদর্শী এমন নয়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে চীন দেশের যুবকেরা নিজেদের সকল গুণাবলীরই মূল্য হ্রাস ক'রে দেখে। অপর পক্ষে আমেরিকার যুবক-বৃন্দ নিজেদের গুণাবলী অতিরঞ্জিত ক'রে তোলে। তবে কি চীনদেশীয় যুবকদের আত্মপ্রীতি এই হিসাবে আমেরিকার যুবকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম? কেবল প্রীতি বা বীতরাগেই দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে এমন নয়। ঐকান্তিক কামনাও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কথা মনে পড়ল। চাক্ষুষ দৃষ্টির অভিজ্ঞতার উপর এ পরীক্ষা হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে জন-কয়েক ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় দিনকয়েক অর্দ্ধ ভোজন ও পরে নামমাত্র ভোজন ক'রে কাটান। নির্দিষ্ট দিনের পর তাঁদের কতকগুলো অস্পষ্ট ছবি দেখানো হয় এবং সে ছবিতে তাঁরা কি দেখেছেন তার বিবৃতি নেওয়া হয়। দেখা যায় সে বিবৃতি বহুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কীয়। কিন্তু মজার বিষয় এই যে সেই অস্পষ্ট ছবিগুলি তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থাতেও দেখানো হয়েছিল। এর আগে তাঁরা নানাবিধ জিনিস সেখানে দেখে-ছিলেন। বলা বাহুল্য খাদ্যদ্রব্যের স্থান সেখানে নিতান্তই গৌণ ছিল। ঐ ক্ষুধাতুর জনকয়েকের কাছে খাদ্যবস্তু নিতান্ত কাম্য ছিল বলেই তাঁদের দৃষ্টিও সে কামনায় রঞ্জিত হয়েছিল। অন্তর্দৃষ্টির বেলায় ঐকান্তিক কামনার প্রভাব এত স্পষ্টভাবে না হলেও খানিকটা আছে বৈকি। সামাজিক সংস্কার মেনে চলা এবং অপরের প্রশংসালাভ আমাদের কাম্য। আমাদের অনেক ব্যবহার, অনেক কার্যাবলী, এর ব্যতিক্রম হলেও আমাদের সঠিক প্রতীতি হয় না।

অন্তর্দৃষ্টির বিকাশের আরও একটি অন্যতম অন্তরায় হ'ল আমাদের কার্য, ব্যবহার ইত্যাদির করণীয় সম্পর্কে অজ্ঞানতা। অমাদের চেতনার স্তরভেদ আছে। যে চেতনা দিয়ে আমরা দেখছি, জানছি তা আমাদের জাগ্রত চেতনা; এর নীচে আছে আমাদের সুপ্ত চেতনা। যা আমাদের সত্তার স্বল্প স্থান অধিকার ক'রে আছে

তাই জাগ্রত চেতনা বা সংজ্ঞান মন। সুপ্ত চেতনা বা নির্জ্ঞান মনের বিস্তার তার তুলনায় অপরিমেয়। আমাদের নানাবিধ ব্যবহার ও কার্যাবলীর কারণ খুঁজলে বহুল পরিমাণে তা এই নির্জ্ঞান মনেই পাওয়া যাবে। এই-ই মনের অবস্থিতি, ব্যপ্তি ও প্রকাশের খবর আমাদের জাগ্রত মন জানে না, তাই আমাদের অনেক কাজ অনেক ব্যবহার আমাদের কাছে অহেতুক ও অবান্তর ব'লে মনে হয়, এবং তাদের কার্যকারণ যোগসূত্রে আমাদের চেতন মনে অজ্ঞাত থাকে। এই কারণিক সম্পর্ক কেউ যদি ব্যক্তভাবে খুলেও ধরে তবু অনেক সময় আমাদের নীতি প্রভৃতি নানা বোধ হয়তো তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারবে না; কারণ তাতে লজ্জা থাকতে পারে, ঘৃণা হতে পারে, অপরাধবোধ প্রতীত হতে পারে। নির্জ্ঞান মনে এমন অনেক বাসনা আছে যা এ সবের উদ্রেক করে। আমাদের সংজ্ঞান মন সে বাসনার পরিতৃপ্তি চায় না, চেপে রাখে। সে অবরুদ্ধ বাসনা নানা বক্র উপায়ে নানান্ ছদ্মবেশে পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে এবং সুযোগ পেলেই কার্য সমাধা করে। যে কার্য আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে অহেতুক তার কারণ আছে নির্জ্ঞান মনে। অসুন্দর সুন্দরে, অগ্রহনীয় গ্রহণযোগ্যে, ঘৃণা ও লজ্জাকর বাহ্যিতে রূপায়িত হচ্ছে। অবশ্য এ রূপায়ণ আমরা জ্ঞাতসারে করছি না—অজ্ঞাতসারেই করছি। তাই এ রূপান্তর অপরকে শোনাবার জন্য সত্যের অপলাপ নয়—তার থেকে অনেক বিভিন্ন; কারণ এ রূপান্তরকে আমরাও সত্য ব'লে জানছি। নির্জ্ঞান মনের এ খেলার জন্য আমাদের আত্মজ্ঞান বহুল পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান আজকাল নানান্ মানসিক বৃত্তি ও গুণাবলী-নিরূপণের উপায় উদ্ভব করছে। অন্তর্দৃষ্টি নিরূপণের প্রয়োজনও যথেষ্ট, বিশেষ ক'রে মনের রোগীর মানসিক পরীক্ষার সময়। সাধারণত প্রশ্নোত্তরের সাহায্যেই তা সম্পাদিত হয়। এ ছাড়াও পরোক্ষ উপায়ে নিরূপণের প্রচেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন—যদিও সে বিষয়ে সবার মনযোগ বিশেষ আকর্ষিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশের সম্ভাবনা কতদূর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। মানসিক রোগীর রোগোপসমের সাথে যখন অন্তর্দৃষ্টি ফিরে পায়, তা অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য ব্যতীত হয় না। রোগীর কি হয়েছে, কোথায় সে অস্বাভাবিক, কেন তার চিকিৎসার প্রয়োজন এ সম্বন্ধে তাকে সচেতন করাতে হয়। তেমনি স্বাভাবিক মনে যদি অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ করাতে হয় তবে তার চরিত্রের ফাঁক ভরাতে, তার গুণাগুণের দিকে, তার নানা কার্য ও ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে তার দৃষ্টি জাগিয়ে তুলতে হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃত বিকাশ কেবল বিচার বুদ্ধি দিয়ে আত্মপ্রতীতিতে হয় না। সত্যকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করলে সে জানা অজ্ঞানতারই রূপান্তর মাত্র।

প্রকৃত আত্মজ্ঞান নিতান্তই দুর্জ্ঞেয়, সর্ব সাধারণের আয়ত্তাধীন নয়। নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে বোঝা, নিজের দোষগুণ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকা, নিজের অন্তরের নিগূঢ়তম অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠের সাথে সুপরিচিত থাকা, নিজের সকল কার্যের ও চিন্তাধারার কার্যকারণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা কজনেরই ভাগ্যে থাকে!

সামাজিক কৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নিমাইচরণ সরকার, এম.এ. *

মানুষের প্রকৃতি এবং আচরণ সভ্যতার মাপকাঠি। 'যুগের নীতি' বলিতে আমরা সেই সময়কার চলিত প্রথা অথবা কৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করিয়া থাকি। কোনও দেশের সভ্যতা সেই যুগের নীতি অথবা কৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সামাজিক কৃষ্টির উৎকর্ষতার মূলে রহিয়াছে মানুষের অবাধ্য প্রকৃতির উপর মানুষের শাসন ক্ষমতা। যে দেশ যত সভ্য সেই দেশের লোকেরা নিজেদের মনের অসামাজিক ও অবাধ্য ইচ্ছাগুলিকে সেই পরিমাণে অবদমণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মানব মনের এই নিষিদ্ধ ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞান মনে নিহিত থাকে। এই ইচ্ছাগুলি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই এবং মনের বহু স্থান জুড়িয়া ইহা ব্যাপিয়া আছে। এই নিষিদ্ধ ইচ্ছাগুলি সর্বদা বহিঃপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করে কিন্তু যেহেতু অসামাজিক সেই কারণে সম্মতি পায় না এবং এই ইচ্ছাগুলি অবদমিত রহিয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এইগুলিকে অবদমিত করা যায় কি? এই সম্বন্ধে কিছু মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু।

বিভিন্ন ধর্মী বৈজ্ঞানিকগণ মানব সভ্যতার বিভিন্ন বিষয় বিচার, আলোচনা ও গবেষণা করিয়া থাকেন। মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের সাধারণজীবনের ক্রিয়াকলাপসমূহ তাহার সামাজিক পরিবেশ ও পারস্পারিক কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করেন। মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া বা শক্তি মুখ্যতঃ কাজ করিয়া থাকে তাহা আদিম বর্বর যুগে মানুষের মধ্যে যেভাবে কার্যকর ছিল, প্রাচীন গ্রীসিয় সভ্যতায় তাহার কোনও প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় নাই, রোমীয় সভ্যতায় কিংবা মধ্যযুগেও না; বর্তমান যান্ত্রিক যুগেও ইহা সমান-ভাবে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে—কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা হয় তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিলে এবং ভালভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে মানুষের পরস্পর-বিরোধী বহু অসামাজিক ও অসন্তোষজনক প্রবৃত্তির নির্গম তৎকালীন সভ্যতার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে হয়। মানুষের এই প্রবৃত্তিগুলি আদিম এবং সাহজিক। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় ইহাকে সহজপ্রবৃত্তি বলা হয়। এই সহজপ্রবৃত্তিগুলি অবদমিত অবস্থায় মানব মনে লুকায়িত থাকে। মানব মনের এই অবদমিত আদিম ও বর্বর প্রবৃত্তিগুলি নানাপ্রকার ছদ্মবেশে যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পায়। সমস্ত প্রকার সভ্যতার বিশ্লেষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মধ্যযুগের জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় বিভিন্ন জায়গীর অত্যাচারের কথা মনে পড়িয়া থাকে। এই অত্যাচারের পিছনেও আছে আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ। মধ্যযুগীয় সভ্যতায় বহিঃপ্রকাশ হইল বিরুদ্ধাচরণ; সেই যুগের সভ্যতাতে মানব মনের গোপন প্রবৃত্তি এইরূপে প্রকাশ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছিল।

বর্তমান যুগেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরা যখন কোনও খেলা দেখি—ধরুন মুষ্টিযুদ্ধ, এই

* ভারতীয় আয়ুধনির্মাণ সংস্থার Senior Technical Assistant (Psycohlogy).

খেলাটির উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে অর্থাৎ যখন উভয় পক্ষ হইতে মুষ্টিবিনিময় চলিতেছে ঠিক তখনই আমাদের মনের এক গোপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যখন একজন সাংঘাতিক ভাবে জখম হয় তখন দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠেন "আহাঃ, বন্দ কর; আস্তে" ইত্যাদি সহানুভূতিসূচক শব্দ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যদিও আমরা এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করি তথাপি সেই দৃশ্যটি উপভোগ করিতে ছাড়ি না। পুনরায় দর্শকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই প্রকার মুষ্টিযুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া সমালোচনা করেন কিংবা এই প্রকার প্রতিযোগিতা অনুমোদন না করেন, তখন অপর পক্ষ এই বলিয়া মন্তব্য করেন যে, "খেলায় ঐ প্রকার ঘটনা দুর্দৈব এবং আকস্মিক, খেলা বা প্রতিযোগিতায় ইহার খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া চলে না।" মুষ্টিযুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশলগুলি উপভোগ করাই এই প্রকার খেলা দেখার সার্থকতা; কিন্তু যদি উভয় খেলোয়াড় সমান কৌশলী হয় তখন খেলা আর তেমন আনন্দদায়ক বা চমকপ্রদ হয় না। যদিও খেলোয়াড়রা খেলার মধ্যে নানাপ্রকার কৌশল ইত্যাদি দেখান, দর্শক-মন ঐ প্রকার খেলায় মোটেই উৎসাহিত হয় না। প্রতিপক্ষ বিপক্ষকে সবল দৃঢ় মুষ্টিদ্বারা পরাজিত করিয়া বিজেতার দাম্ভিকতা প্রকাশ করুক, দর্শক-মন ইহাই উপভোগ করিতে চাহে। কিন্তু যখনই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কোনও একজন সাংঘাতিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার কর্মক্ষমতা হারাইয়া বসে তখন দর্শকগণ বলিবেন—এই প্রকার পরিণাম অভিপ্সিত নহে, এই প্রকার খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ইত্যাদি। অবশেষে এমনও বলিতে পারেন যে, "এইরূপ মুষ্টিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তাহাদের তো কেহ জোর করিয়া আনে নাই, তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যোগ দিয়াছেন"। সুতরাং দেখা যাইতেছে অবস্থা বুঝিয়া দর্শকগণ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিজেদের সমস্ত সম্পর্ক ও দায়ীত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত করার জন্য এই প্রকার যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। অন্য দিকে দেখা যায় তাঁহাদেরই আর্থিক সাহায্য দ্বারা এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠে। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণস্বরূপ জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেই তাঁহারা আবার মুষ্টিযোদ্ধাদের উপর দোষ চাপাইয়া ক্ষান্ত হন।

সাধুতা ও সততার এই প্রকার ছলনার সাহায্যে আমরা অবদমিত সহজপ্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিয়া থাকি। সভ্যতার উৎকর্ষতা ও আমাদের সভ্যসমাজ, মনের এই ধর্মকামী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই উপায় করিয়া দেয়, প্রেরণা যোগায় এবং সাহায্যও করিয়া থাকে। আবার অন্যদিকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মাপকাঠির সাহায্যে ইহার গুরুত্ব ও স্থিতি সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত মতামত স্থাপন করে। এইরূপ ক্রিয়া-কলাপ মানুষের প্রকৃতিবিরোধী গর্হিত কাজ, কারণ একজন অন্যজনকে প্রহার করিবে ইহা দেখিয়া কেহ কখনও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না। ইহা সভ্য জগতের মানুষের নীতি নহে, তথাপি দেখা যায় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান মারফৎ মানুষের এই সহজপ্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ হইয়া থাকে।

সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তাহার চরিত্র বিশ্লেষণে আমরা যাহা দেখিতে পাই, জাতির চরিত্র বিশ্লেষণেও সেই সমস্ত প্রবৃত্তি স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ঐ একইপ্রকার পরস্পরবিরোধী বাসনার সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহারা শান্তি, মৈত্রী ও মুক্তির ধুয়া তুলিয়া থাকেন, নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য জাতিসংঘ বৈঠকে সম্মিলিত হন, অন্যদিকে তাঁহাদের মধ্যেই উপনিবেশ-বিস্তার ও যুদ্ধকামী প্রবৃত্তিগুলি অবদমিত থাকে; মানব মুক্তির আন্দোলন ও মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার নামে তাঁহারাই আবার উপনিবেশগুলিতে মুক্তাকাংক্ষী জনসাধারণের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন। নিরস্ত্রীকরণ

সম্মিলনীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার মতান্তর ও সন্দেহের কারণ সৃষ্টি হয় এবং সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি বা লিপ্সার সংঘাতে কোনওপ্রকার মীমাংসা গ্রহণ করা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়া যায়। জাতীয় জীবনেও বিরুদ্ধাচরণ ও ধর্মকামী অবদমিত প্রবৃত্তিসকল এই প্রকারে বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকে।

যেহেতু আমরা সভ্য সমাজে বাস করি সেই কারণে কোনও এক আকস্মিক যোগাযোগের জন্য সভ্য সমাজ আমাদের এই প্রকার প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে যে অনুমোদন করে এমন নহে। যদি কোনও সমাজ তাহার লোকদের নিষিদ্ধ, অবদমিত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে অনুমোদন না করে এবং চরিতার্থ করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধা না দেয় তাহা হইলে সঞ্চিত পুঞ্জিভূত প্রবৃত্তিগুলির শক্তি সমাজে বিশৃঙ্খল ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। সম্ভবতঃ ঠিক এই কারণের জন্যই প্রবল একচ্ছত্রবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহে সাধারণ লোকের ভিতর বিরুদ্ধাচরণ প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে এই প্রবৃত্তিকে যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের দিকে পরিচালিত করে। কিন্তু প্রবীণ, ধুরন্ধর, একচ্ছত্রবাদী শাসক জনসাধারণের এই বিদ্রোহী মনোভাবগুলি বিপক্ষদলের দিকে পরিচালিত করিয়া নিজ দলের মধ্যে সংলগ্নতা, শাসনশৃঙ্খলা ও তৎসহ স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখেন। এই প্রবৃত্তিগুলির নিকাশনের উপায় করিয়া না দিলে এইগুলি জনসাধারণের ভিতর অবদমিত থাকিয়া যাইত ও ভবিষ্যতে নানাপ্রকার অশান্তিজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। কোনও লোককে যদি অবজ্ঞা করা হয় এবং তাহার স্বীকারে যদি বাধা দেওয়া হয় তখন তাহার মনের ইচ্ছাগুলি বিদ্রোহী হইতে থাকে এবং সে তখন নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে; মনে মনে সারা পৃথিবীতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। নিজের সম্বন্ধে যদি সে এই প্রকার ধারণা পোষণ না করে তাহা হইলে হয় সে আত্মঘাতী হয় নতুবা সে তাহাকে হেয় চক্ষুতে দেখে এবং তাহার মনের বিরূপ ধারণার কারণ তাহাকে বিনষ্ট করিতে চাহে।

গণতান্ত্রিক সামাজিক নীতির উৎকর্ষতার আদর্শের মূলে অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করিবার বহু নির্গম পথ থাকার জন্য বিদ্রোহী মনোভাব ও বিপক্ষতাচরণ প্রবৃত্তি যথেষ্ট প্রশমিত থাকে। গণতান্ত্রিক সামাজিক নীতিতে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনেও অল্প পরিমাণে নিষিদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পায়। গণতান্ত্রিক নীতির মূলে এইপ্রকার মনোস্তাত্ত্বিক রহস্য বিদ্যমান থাকায় মানব মনের বিদ্রোহী মনোভাব যথেষ্ট আয়ত্তাধীন থাকে।

আমরা বর্তমানে প্রগতিশীল যান্ত্রিকযুগে বাস করি এবং অতীতের সভ্য সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক উৎকর্ষতা বহু উন্নত বলিয়া গর্ববোধ করিয়া থাকি; কিন্তু এই সভ্যতার বিশ্লেষণে যে সমস্ত লক্ষণগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা হইল, প্রথমতঃ মানুষের প্রবল অধিকার লিপ্সা—মানব প্রবৃত্তি অধিক সম্পদ ও শক্তি আহরণের জন্য সর্বদা নিয়োজিত। যে অনুপ্রেরণা আমাদের মধ্যে স্পষ্টই অনুভূত হয় তাহা হইল অর্থলিপ্সা ও স্বীয় জীবনে স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি। দ্বিতীয়তঃ ইহা এক প্রতিযোগিতামূলক যুগ; এই যুগে মানুষ কেবল অধিক ক্ষমতা প্রয়াসী নহে, ক্ষমতা পাইয়াও সে ক্ষান্ত হয় না—বিপক্ষকে দুর্বল করিয়া বিতাড়িত করিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। তৃতীয়তঃ দেখা যায় এই যুগে সব জিনিসই আমরা পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণয় করিয়া থাকি এবং সকল জিনিসই গ্রাফের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা যায়। বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্রিয়াকলাপ গ্রাফের মধ্যে প্রতিফলিত করিলে দেখা যায় যে যেখানে গোষ্ঠীর স্থান সেখানে সাধারণ মানুষ নগণ্য।

সুতরাং দেখা যায় একদিকে গোষ্ঠী গণনায় ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা দ্বারা গণনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়, আবার অন্য দিকে ব্যক্তি স্বাধীকার এবং মানবমুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন ও দাবি প্রভৃতি চলে। শেষতঃ ইহা পরিলক্ষিত হয় যে বর্তমান যুগে মানুষের কাছে সময়ের মূল্যই সবচেয়ে বেশী, মানুষ তাহার এক মুহূর্ত সময়ও অকাজে ব্যবহার করিতে চাহে না, এবং প্রতিমুহূর্তেই লাভক্ষতির অঙ্ক কষিয়া কাটায়। বাহ্যিক আড়ম্বর এবং অর্থের অপব্যয়ের মাত্রা দেখিয়াই গুণাগুণ বিচার বর্তমান কালের ধর্ম। যখন এইগুলিকেই ব্যক্তিত্বের মানদণ্ডস্বরূপ দেখা হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক অবনতি এবং চরিত্রের দুর্বলতা প্রভৃতি গালভরা কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন মনে হয়।

সামাজিক জীবনের এই প্রকার কৃষ্টি মানবজাতি ও সভ্যতাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। মানুষ বহু সমস্যার সম্মুখীন। আর্থিক অনটনের জন্য একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথা মৃতপ্রায়। মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সদা সংশয় জাগে। এই কারণেই অধিকাংশ লোক সাংসারিক জীবন-যাপন করিতে ভরসা পায় না, এবং অধিক বয়সে বিবাহ করে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পারিবারিক জীবনের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কল্পনায় অপ্রাকৃতিক সুখ ও আনন্দের জাল রচনা করা সকলের মধ্যেই প্রতীয়মান হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর মানুষের আগ্রহ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেছে। মানুষের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিই হইতেছে ইহার উৎস কেন্দ্র। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমাদের বর্তমান সভ্যতা ও কৃষ্টি জীবনধারাকে ক্রমশঃই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষ সুখ ও শান্তি পাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহা পাইতেছে না।

আধুনিক যুগের উৎকর্ষতার মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি প্রকটিত হয়; যথা: অর্থ-লিপ্সা, কার্পণ্য, অবাধ্য প্রকৃতি, পরিপাটী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ, কথার মধ্যে বিশ্বাসের অভাব, অত্যধিক লৌকিকতা প্রদর্শন এবং প্রকৃত অনুভূতি-বিরোধী মনোভাবগুলিকে যুক্তি দ্বারা তথ্যরূপে স্থাপন করা ইত্যাদি।

যুগের উৎকর্ষতা মানবচরিত্রকে শুষ্ক করিয়া থাকে এবং মানুষের লক্ষ্য হয় সামাজিক কৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলা। এই প্রকার উদ্যমে মানবচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগের উৎকর্ষতা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং আগামী যুগের মানব সমাজ এই যুগের সভ্যতার মূল্য নিরূপণ করিবে। আমরা এ যুগের তথাকথিত সভ্যতার সাধারণ দর্শক মাত্র।

শিশুর ধর্মবিশ্বাস

শ্রীমতী সন্ধ্যা ভট্টাচার্য।

ধর্ম কী? ধর্মের পরিভাষা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতের মধ্যে পৃথক্; স্বভাবতঃই তাদের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর কাছে। তবে সকল ধর্মের মূলকথা একই। আর প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী জাতের শিশুদের ধর্মচেতনাও মোটামুটি একই ভাবে গ'ড়ে ওঠে।

শিশুরা স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয় এবং তার ধর্মবোধটিও তার পরিবেশ এবং পিতামাতাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেই গ'ড়ে ওঠে।

কৌতূহলী শিশুর মন এই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছু সম্বন্ধেই অগাধ কৌতূহল পোষণ করে এবং সে তার প্রশ্নের সমাধান চায়। তার মাকে প্রশ্ন করে:—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে?
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

শুধু তাই নয়; পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধেই তার ঔৎসুক্যের অভাব নেই। প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তোলে তার আত্মীয়-পরিজনদের।

আনুমানিক ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়স থেকেই শিশুর মনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হয়। "ভগবান কে? স্বর্গ কোথায়? কী ক'রে সেখানে যাওয়া যায়? পাপ কী? মৃত্যু কী? জন্ম কেমন ক'রে হয়?"—ইত্যাদি নানারকম ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন তার মনে উদিত হয়। মা বাবার কাছ থেকে সে এই-গুলির উত্তর যা পায় সেগুলিও ধর্মের সঙ্গে জড়িত। এবং সে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই ধরনের উত্তরে সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এই উত্তরগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয় এবং এটা সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিকালেই দেখা দেয়। "ভূত, প্রেত, দৈত্য, স্বর্গ, নরক, দেবদূত, পাপপুণ্য, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ঘটনাগুলিও সে তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে যাচাই ক'রে নেয়। ছোট-বেলা থেকেই যেমনভাবে সে এইগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা পায় তার ধারণাগুলিও তারই উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে। তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব কিছুই শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এই শিক্ষা সে বাড়িতেই গুরুজনদের কাছ থেকে পায়; কিংবা কোনও মন্দিরের পুরোহিত অথবা শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকেও পেতে পারে। শিশুর মন সাধারণতঃই বিশ্বাসপ্রবণ; এবং বিচার ক'রে দেখার মতো মানসিক গঠন তখনও তার হয় না ব'লে অনেক সময় তার ধারণাগুলি পরস্পর-বিরোধী হতেও দেখা যায়। যেমন ধরুন শিশুর ধারণা ভগবান খুব দয়ালু, কিন্তু আবার সে এও মনে করে যে তিনি দুষ্ট লোকদের কঠিন সাজা দেন।

ধর্মসম্বন্ধীয় গালগল্প, ব্রতকথা, পুরাণের কথা, ভাগবতের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তার কাছে রূপকথা, উপকথার চেয়ে কম লোভনীয় নয়। তবে শিশুর বয়স ভেদে গল্প উপাখ্যানের বিষয়বস্তুও পৃথক্ হতে থাকে, যেমন ৭।৮ বছরের শিশুরা সাধারণতঃ রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদির ছোট-

বেলাকার ঘটনার কথাই বেশী শুনতে চায়—তাঁদের বীরত্বের কথা, শিক্ষার কথা, খেলাধূলার কথা, ইত্যাদি। আরও একটু বড় বয়সের ছেলেমেয়েরা ঘটনার ঐতিহাসিক দিক্‌টাও বিবেচনা করে এবং জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে। এখন আর গল্পের ধর্মীয় গুরুত্বের দিক্‌টা ততটা তার মনকে নাড়া দেয় না।

ধর্মের দিকে আকর্ষণ

ছোট ছোট ছেলেদের নিজ ধর্মের প্রতি বেশ ভক্তি থাকে—পুজাপার্বণের সময়কার আচার-অনুষ্ঠান, পরিচ্ছন্নতা, সাজ-সজ্জা তার মনে বেশ ভয়মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার ক'রে থাকে। তা ছাড়া বড়দের কাছ থেকে সে এইসব অনুষ্ঠানে যথাযথ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানো উচিত এ রকম নির্দেশ পেতে পেতে তার মনে আপনা থেকেই একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। যদিও এই ধর্মবোধটা তার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং অহম্‌কেন্দ্রিক (ego centric), কারণ সে শুনে আসছে ভগবানের কাছে যা প্রর্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায়—মধুসূদন দাদার গল্পের মতো। এ মনোভাব খুবই সৎ এবং এটা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাল রেখে গঠিত হতে থাকে।

ধর্মশিক্ষা

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিশুদের একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা দেবার রীতি নেই, কারণ শিশুর মনে ধর্মচেতনা জাগরুক না হলে তাকে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ নেই। অনেক আদিম জাতির মধ্যে এখনও বয়ঃসন্ধির সময়েই কোনও একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

আমাদের হিন্দু ধর্মেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৯ থেকে ১২ বৎসরের মধ্যেই উপনয়ন রীতির প্রচলন দেখা যায়—অর্থাৎ ঐ সময় থেকেই সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানবার অধিকারী হয়, তার পুর্বে তার ধর্ম শিক্ষা লাভের বয়স হয় না।

অবশ্য খ্রীষ্টানদের এবং মুসলমানদের এবং অন্যান্য ধর্মবিশিষ্ট বহু জাতের মধ্যে শিশু যখনই কথা বুঝতে শেখে তখন থেকেই ধর্ম শিক্ষার শুরু হয়।

ছেলেমেয়েরা যাতে বয়ঃসন্ধির সময় ধর্মে অবিশ্বাসী না হয়ে পড়ে তার জন্য পিতামাতা শিশুকাল থেকেই তাদের মনে ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অন্ধসংস্কার বদ্ধমূল করিয়ে দেবার চেষ্টা করেন ; এটা করা ঠিক নয় তার কারণ শিশুর মন তখনও ধর্মের গুরুত্ব বোঝার মত হয়ে গ'ড়ে ওঠে নি। বড়দের বই পড়া যেমন শিশুর অনুচিত তেমনি ধর্মশিক্ষা কেবল পরিণত বয়সের পক্ষেই উপযুক্ত—সেটাও শিশুর ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়। তবে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক্‌টা বাদ দিয়ে ধর্মের নৈতিক শিক্ষার দিক্‌টা শিশুর পক্ষে প্রকৃত ধর্মশিক্ষার গোড়াপত্তন হিসেবে খুবই বাঞ্ছনীয় ; যেমন—সত্যকথা বলা, কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ না করা, দয়াশীল হওয়া, স্নেহ-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির বিকাশ করা ইত্যাদি। বাল্যকালে যদি এই শিক্ষা ঠিক মতো না দেওয়া যায় অথবা ভুল ভাবে দেওয়া হয় তবে ভবিষ্যতে শিশুটির নাস্তিক ভাবাপন্ন, স্বেচ্ছাচারী এবং অধার্মিক, উদ্ধত, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হওয়া বিচিত্র নয়।

শিশুর ধর্মবিশ্বাস তার ধর্মশিক্ষার দ্বারা গঠিত ধারণার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মোটকথা বাস্তব ভিত্তির উপর নির্ভর করেই—ধর্মের বই-এর ছবি দেখে, গল্প শুনে, বাড়িতে পিতামাতা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা প্রভৃতি গুরুজনদের ধর্মীয় আচরণ লক্ষ ক'রে —শিশুর ধর্মবিশ্বাস গ'ড়ে ওঠে।

টোটেম ও টাবু*

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

[পুর্ব প্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাবু ও প্রক্ষোভের উভয়বলতা

(১)

'টাবু' কথাটি একটি পলিনেশীয় শব্দ। এর অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে শক্ত, কেন না, শব্দটি যে ভাবার্থ প্রকাশ করে তার সঙ্গে আমাদের এখনও সম্যক পরিচয় ঘটে নি। প্রাচীন রোমকদের মধ্যেও এটা প্রচলিত ছিল। রোমকদের "sacer" এবং পলিনেশীয়দের 'টাবু' এই দুই শব্দের অর্থ একই। গ্রীকদের αγος শব্দ এবং ইহুদীদের Kodaush শব্দ এবং পলিনেশীয়দের 'টাবু' শব্দ সমার্থবোধক। আমেরিকা, আফ্রিকা (মাদাগস্কার), উত্তর ও মধ্য এশিয়ার বহু জাতিও অনুরূপ শব্দের মারফৎ একই ভাব প্রকাশ ক'রে থাকে।

আমাদের কাছে 'টাবু'র অর্থ দুইটি, এবং তারা বিপরীত ধর্মী। এক পক্ষে ইহা পুত, পবিত্র এবং অপরদিকে ইহা অসোয়াস্তিকর, বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র। পলিনেশিয়াতে টাবুর বিপরীতার্থবোধক শব্দ হচ্ছে '*noa*', যার অর্থ হচ্ছে, যা-কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য। অতএব 'টাবু' কথাটির মধ্যে সংরক্ষিত, নিষিদ্ধ এই ধরনের একটি ইঙ্গিত রয়েছে। 'টাবু' বলতে আসলে নিষিদ্ধ এবং আপত্তিজনক ভাবেরই প্রকাশ পাচ্ছে। "পবিত্র-ভয়" এই যুগ্ম শব্দের দ্বারা অনেক সময় 'টাবু' কথাটির ভাবার্থ প্রকাশ হয়ে থাকে।

টাবুর বাধানিষেধগুলি ধর্ম সম্পর্কীয় ও নৈতিক আপত্তি থেকে ভিন্ন। টাবুর বাধানিষেধের সঙ্গে দৈবের কোনও যোগ নেই। আসলে নিষেধগুলি মানুষ নিজেদের ঘাড়ে নিজেরাই চাপিয়ে দিয়েছে। নৈতিক দিক থেকে যখনই কোনও আপত্তির কথা ওঠে তখনই ওরূপ আপত্তির ভিত্তি থাকে প্রয়োজনীয়তার উপর এবং প্রয়োজনের কারণও দেখানো হয়। টাবু নিষেধবিধিগুলি এই দিক থেকে ভিন্ন, এ-ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমানাদির কোনও বালাই নেই এবং এদের মূল উৎস কোথায় তাও অজ্ঞাত। আমাদের কাছে অজ্ঞেয় হলেও যারা এই সব নিষেধবিধির আওতায় পড়েছে তারা এগুলিকে অবশ্যপালনীয় হিসাবেই গ্রহণ করেছে।

ভুণ্ড (Wundt) টাবুকে মানবতার সবচেয়ে পুরানো অ-লিখিত আইন ব'লে বর্ণনা করেছেন। টাবু দেবতাদের চেয়েও পুরানো এবং প্রাক্‌-ধর্মযুগের ব'লে সাধারণত ধ'রে নেওয়া হয়।

টাবু সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ আলোচনা করতে চাই। সেইজন্য মনঃসমীক্ষণের দিক থেকে বিচার করার আগে নৃতত্ত্ববিদ্‌ নর্থকোট. ডব্লু. টমাস (North W. Thomas) লিখিত 'টাবু' নামক প্রবন্ধটির কিছু অংশ 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে উদ্ধৃত করছি।

* ডাঃ এ. এ. ব্রিল-এর ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত। অনুবাদ—ধনপতি বাগ, এম. এস্‌ সি.।

'ঠিক ক'রে বলতে গেলে 'টাবু' বলতে কেবলমাত্র বোঝায় (ক) বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র (বা অপবিত্র) ভাব, (খ) এই পবিত্র বা অপবিত্র ভাব থেকে উদ্ভূত নিষেধাজ্ঞা, এবং (গ) নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলে যে সব পবিত্রতার (বা অপবিত্রতার) সৃষ্টি হয় সেইগুলি। পলিনেশিয়াতে 'টাবু'র বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'নোআ' (*noa*) এবং এরই সমগোত্রীয় শব্দাবলীর মানে হচ্ছে 'সাধারণ', বা 'চল্‌তি'…

"সাধারণভাবে দেখলে টাবুকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন (১) স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ, যেখানে ম্যানা (mana) বা অদ্ভুত শক্তির ফল ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই নিবদ্ধ; (২) প্রচলিত বা অপ্রত্যক্ষ এখানেও 'ম্যানা'র শক্তি বর্তমান, তবে সে-শক্তি হয় (ক) সংগৃহীত, নয়তো (খ) সর্দার বা অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত; (৩) মধ্যধর্মী, যেখানে উপরোক্ত দুটিই বর্তমান, যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশেষ ব্যবহার। টাবু শব্দটি বিভিন্ন ধরনের ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচারের উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই অর্থে এর ব্যবহারকে এড়িয়ে চলাই যুক্তিসঙ্গত। যে সব ক্ষেত্রে নিষেধগুলির অনুমোদন কোনও দৈবশক্তি বা প্রেতশক্তি কর্তৃক হয়ে থাকে সেই সব ক্ষেত্রেও টাবু শব্দটি ব্যবহার করার কথা উঠতে পারে। অর্থাৎ ভৌতিক বা অপ্রাকৃতিক বিষয় থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রয়োগের জন্য টাবু শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কোন স্বয়ংক্রিয়তা বা সংক্রমণ নেই, সেইজন্য এ গুলিকে ধর্মীয় নিষেধবিধি মনে করাই বেশী যুক্তিসঙ্গত।

"টাবু ব্যবহারের উদ্দেশ্য বহু: (১) প্রত্যক্ষ টাবুর উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) দলপতি, গুরু প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তি ও বস্তুকে বিপদ থেকে রক্ষা করা; (খ) দুর্বলকে আশ্রয় দান—যেমন স্ত্রীলোক, শিশু এবং সাধারণ লোককে সর্দার এবং গুরুদের কবল থেকে (যাদুকরী বিদ্যার প্রভাব থেকে) রক্ষা করা; (গ) কতগুলি বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া—যেমন মৃতদেহ নাড়াচাড়া করা বা তার সংস্পর্শে আসা, কোনও খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারজনিত বিপদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা; (ঘ) জন্ম, উপবীত (initiation), বিবাহ এবং যৌনক্রিয়া প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান কাজকে বিপত্তি থেকে রক্ষা করা; (ঙ) দেবতা এবং প্রেতাত্মাদের ক্রোধের বিরুদ্ধে মানবকে নির্ভয় দান করা; (চ) ভ্রূণস্থিত শিশু এবং ছোট ছেলেমেয়েদের সংরক্ষণ: বিশেষ ক'রে যে সব ছেলেমেয়ে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে খুব সহৃদয়তার সহিত সম্পর্কিত। এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কতগুলি কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে, বিশেষ ক'রে খাদ্যবস্তু থেকে সংগৃহীত কতগুলি গুণাগুণের সঞ্চালনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা। (২) চোরের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খেত-খামার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রক্ষার জন্যও "টাবু" আরোপিত হয় থাকে।"

প্রবন্ধটির অন্যান্য অংশের সংক্ষিপ্তসার এইরূপ হতে পারে। গোড়াতে টাবু-বিরুদ্ধ কাজের জন্য শাস্তি খুব সম্ভবত বিবেক-বিচারের উপরই ছেড়ে দেওয়া হ'ত। অর্থাৎ টাবুর নিয়মভঙ্গের জন্য টাবুই তার প্রতিশোধ নিত। যখনই কোনও দেবতা বা দানবের সঙ্গে 'টাবু'র সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল তখনই শাস্তি-বিধানের কর্তা হ'ল সেই দৈব বা দানবীয় শক্তি। অন্যান্য ক্ষেত্রে, খুব সম্ভবত ভাবের উৎকর্ষের ফলে যে ব্যক্তি তার সঙ্গীদের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল তার শাস্তির বিধান ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করলে সমাজ। এইভাবে মানুষের শাস্তি বিধানের প্রথম পদ্ধতিও টাবুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল।

"টাবুর নিয়ম ভঙ্গ করলে সেই ব্যক্তি নিজেই টাবু হয়ে যায়।" লেখক আরও বলেছেন যে, টাবুর নিয়ম ভাঙলে যে বিপদ আছে তা অপরাধীর প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়াকলাপ ও কঠিন অনুষ্ঠানাদি থেকেই বোঝা যায়। (ক্রমশঃ)

লুম্বিনির—
রচনা ও কলা

"লোকে আমাকে পাগল বলে"

লোকে আমাকে পাগল বলে। তা বলুক তাতে আমার ক্ষতি কি? তারা বলে আমি নাকি যা তা ভাবি আর বড্ড বাজে কথা বলি। লুম্বিনীতে পাঠিয়ে আমার চিকিৎসা করাবে, shock therapy করাবে, ওষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে, যাতে আমার প্রলাপ বাক্য শুনে অন্য লোকের মাথা খারাপ না হয়, অন্য লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত করবার আমার কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা আদৌ নেই। কিন্তু আমার ভাববার স্বাধীনতা ছাড়তে আমি একেবারেই রাজি নই এবং যেটা সত্য বলে আমার মনে হবে সেটা ব্যক্ত করতে আমি একটুও কুণ্ঠিত হব না। বেশ ত ঘুম পাড়িয়ে রাখুক না, সব মানুষই ত ঘুমোয়, কিন্তু তারা আবার জাগে ত, আমিও আবার যখন জাগব তখন ভাবব আর যা ভাবচি তা বলব।

আসল কথা হচ্ছে আমি যা ভাবি তারা সাধারণত সে রকম ভাবে না—তাই আমাকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখে আর মনে মনে বোধহয় একটু ভয়ও পায়। সবাই অনেকটা এক রকমের খাওয়া দাওয়া করে, এক রকমের কথাবার্তা বলে এমন কি চিন্তাধারা প্রক্ষোভের গতি প্রভৃতি এক রকমের করে নিয়ে মিলে মিশে পরস্পরের সঙ্গে একতাবোধ করে মোটামুটি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তার মধ্যে হঠাৎ যদি কেউ একেবারে কতকগুলো নতুন ধরনের কথা বলতে আরম্ভ করে যা তাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন তাদের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়; নিরাপত্তা বোধ নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তাই সেই লোকটাকে যতক্ষন না তাদের সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণ তারা স্বস্তি অনুভব করে না, তাদের নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসে না, তাই সকলে মিলে তাকে পাগল আখ্যা দিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। সে সেরে উঠেছে কখন বলবে যখন সে তার নতুন ধরনের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চিরাচরিত ধারা মেনে নিয়ে আর পাঁচজনের মতই ভাববে আর কাজ করবে।

আমি কিন্তু এই আচরণের ঘোর বিরোধী। সেই জন্যেই বোধহয় আমাকে পাগল বলে। তাদের হাতে ক্ষমতা আছে বলে তারা আমায় আমার ইচ্ছামত ভাবতে দেবে না? এ অধিকার তাদের কে দিয়েছে? নানা অজুহাতে আইনের শরনাপন্ন হয়ে চিন্তার প্রকাশ্য রূপ দেওয়াটা হয়ত তারা বন্ধ করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না আমার ভাববার ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে, ওষুধ খাইয়েই হোক আর অপারেশন করেই হোক ততক্ষণ আমি ভাববই এবং আমার মতই ভাবব, তাদের হিসেব মত নয়। আর ভাবনাগুলো ব্যক্ত করবার চেষ্টাও একটু আধটু করব। (যেমন এখন করছি, আপনাদের কাছে জানাচ্ছি যাতে আপনাদের অসংখ্য পাঠক পাঠিকারা আমার কথাটা শুনতে পান। আপনারা ছাপাবেন কি না তা অবশ্য জানি না—না-ই ছাপালেন তাতে আমার কি গেল এল?)

একটা কথাই বলি এবার—কোন মানুষের চিন্তাধারা সাধারণ চিন্তাধারা থেকে তফাৎ, খুব বেশী তফাৎ হলেও তখনই তাকে পাগল বলে ঘৃণা করা এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার মতে আপনাদের অমার্জনীয় অপরাধ। (কি যন্ত্রণাটাই না আপনারা, মানে আপনাদের সমাজ আমাকে দিয়েছে,

কারণ আমি ভেবেছিলুম এবং সেটা বলেওছিলুম যে—যাক সে কথা আর এখন তুলে কাজ নেই।) এরোপ্লেনের যুগের আগে একজন বৈজ্ঞানিক ভেবেছিলেন যে মানুষ পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে—তখন আপনাদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি হাসিই হেসেছিলেন। গ্যালিলিওকে (Galilio) হাজতে পুরে ফেলে কি স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতা উলটালে বিজ্ঞ লোকদের এই রকম কীর্ত্তির বহু পরিচয় মেলে। শুধু বিজ্ঞান কেন, আপনাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, আপনাদের ধর্ম তথাকথিত কৃষ্টি, এ সবের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ভাবলেই বা করলেই আপনারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন, পারলে শাস্তি দেন, না পারলে গালাগালি করে গায়ের ঝাল ঝাড়েন। বিরুদ্ধাচরণ করাটাকে আপনারা প্রায় পাগলামির পর্য্যায়েই ফেলেন। কিন্তু গ্যালিলিও যা বলেছিলেন তা ত সত্যিই। আর মানুষ আজ-কাল স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তা হলে? পাগলামি, আজগুবি কল্পনা এসব কথাগুলো ব্যবহার করবার আগে একটু ভেবে দেখবেন কি?

আর দেখুন, যাকে আপনারা 'ছিট', পাগলামি বলেন সেই রকম একটু না থাকলে কোন লোক কোন বড় কাজ করতে পারে? পেরেচে এ পর্য্যন্ত? বড় বড় মনস্বীরা যাঁরা পৃথিবীতে সৃষ্টি মূলক, গঠন মূলক কাজ সব করে গেছেন তাঁদের অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস জানতে আপনারা ত ছি, ছি, তোবা, তোবা করে দশহাত দূরে সরে যাবেন, না হয়ত বদ্ধ পাগল বলে খুব একটা বিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন। লোকটা না খেয়ে, খাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করে পাহাড়ের একটা গুহায় দিনের পর দিন পড়ে আছে, পোকা মাকড়ে তাকে কামড়ে রক্তপাত করছে, লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্চয়ই একে পাগল বলবেন। কিন্তু যখন শুনবেন লোকটি হচ্ছেন রমন মহর্ষি, হয়ত একটু চোক গিলবেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে,—তা সে বিজ্ঞানই হোক, সঙ্গীতই হোক, ধর্মই হোক, যাই হোক—সকলেরই সাধনার দরকার। আর সাধনার সময় তাদের ব্যবহার সাধারণ লোকেদের মত ত হয়ই না, উপরন্তু অনেক অসঙ্গতিতে ভর্ত্তি হয়ে উঠে। চিরাচরিত আচার ব্যবহার মেনে নিয়ে চিরাভ্যস্ত কাজ একই প্রনালীতে করে গিয়ে, আহার, নিদ্রা, মৈথুনের সুখ উপভোগ করে, জীবনটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেওয়া যায়। দিন না আপনারা, আমি কি বারণ করচি, আমি বারণ করবার কে! কিন্তু আমি যদি ঠিক ঐ নিয়মে না চলি আপনারা অত খাপ্পা হয়ে ওঠেন কেন? আমায় হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন কেন?

এই 'কেন'র জবাব দেবার জন্যে আপনারা উদগ্রীব হয়ে উঠেচেন নিশ্চয়ই। চোখা চোখা প্রশ্নবান সব পরের বারে এই পত্রিকা মারফৎ ছুঁড়বেন বোধহয় আমার দিকে। তা ছুড়ুন, আমার ইচ্ছে হয় জবাব দোব যখন খুশী, না হয় দোব না। যা বলচি তার মধ্যে বোধহয় আরও জোর প্রমাণ পেয়েছেন যে আমি শুধু পাগল নই, একেবারে যাকে বলে বদ্ধ পাগল—উন্মাদ। মনে রাখবেন কিন্তু Truth begins in a minority of one। আগে বুদ্ধ একা তারপর বৌদ্ধধর্ম। আগে Einstein তারপর Relativisitsএর দল। আগে Christ তারপর Christianity। ভেবে দেখুন Robber ই robber না Alexander robber. —ইতি

আপনাদের মতে,
'পাগল'